২

নাট্যকলা

ক. লোকনাট্য

ক. ১. পরিচয় ও বিশ্লেষণ

সাইদুর রহমান লিপন

হাজার বছরের বাংলার লোকসংস্কৃতির বহু সমৃদ্ধ ও প্রাচীনতম শাখার মধ্যে 'নাট্য' অন্যতম। বাংলা লোকসংস্কৃতির নানান ধারা-উপধারার আলোচনায় লোকসংগীত, লোকসাহিত্য, লোকছড়া, লোকক্রীড়া, উৎসব, পার্বণ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত ও জোরালো উপস্থিতি থাকলেও একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে 'নাট্যে'র আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এমন দাবি করা যায় না। এর কারণ হিসেবে মূলত লোকসংস্কৃতির নানাবিধ পরিবেশনায় সংগীত, নৃত্য, কথা ও বাদ্যের দ্বৈতাদ্বৈত অবস্থান ও উপস্থাপনাকে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ কথা, সুর-সংলাপ ও আখ্যানের পারস্পরিক সহাবস্থানের কারণে একটি পরিবেশনাকে যেমন 'নাট্য' হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব, তেমনি সুর ও ছন্দের আধিক্যের কারণে আবার কোনো কোনো পরিবেশনাকে 'গীত' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। উদ্ধৃতি সহকারে প্রমাণ করা সম্ভব যে, বহু গবেষক 'গম্ভীরা' বা 'আলকাপ', পরিবেশনারীতিকে লোকসংগীত হিসেবে জোরালো যুক্তির সাথে আলোচনা করেছেন। অথচ বর্তমান সময়ের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পর্যালোচনায় এই দুটি-ই সমৃদ্ধ লোকনাট্যরীতি হিসেবে স্বীকৃত। পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্য ও শিল্প-অনুরাগী কেউ কেউ আবার পাশ্চাত্যের প্রেক্ষাগৃহ নির্ভর নাট্যরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার নাট্যচর্চার ঐতিহ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে লোকসংস্কৃতির বর্ণিল নাট্যঐতিহ্যকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেন না। তাঁরা পাশ্চাত্য নাট্যচর্চার আলোকে বাংলার নাট্য ঐতিহ্য অন্বেষণে ব্রতী হলেন এবং বাংলা নাট্যের ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংলাপাত্মক রীতিতে পরিবেশিত 'যাত্রা'সহ দু-একটি রীতিকেই 'লোকনাট্য' হিসেবে উল্লেখ করেন। এরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের 'লোকনাট্য' সম্পর্কে বিশদ কোনো আলোচনার পূর্বে 'নাট্য' শব্দটির ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন, যা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সমান্তরালে লোকনাট্যকে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।

সাম্প্রতিক কালে 'নাট্য'কে একটি সাধারণ সংজ্ঞার সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয় "যেকোনো ত্রিমাত্রিক আয়তনে এক বা একাধিক অভিনেতা/নেত্রী কর্তৃক অপর এক বা একাধিক দর্শক সম্মুখে কোনো কিছু করা বা 'ক্রিয়া'র উপস্থাপনাকে 'নাট্য' বলে"। এখানে 'ক্রিয়া'র উপস্থাপনা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি দুই ভাবে হতে পারে। প্রথমত, ক্রিয়াটি তাৎক্ষণিক ভাবে বা মুখে মুখে রচিত কোনো ঘটনা অথবা আখ্যানের পরিবেশনা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পূর্বনির্ধারিত কোনো বিষয় যা লিখিত আকারে বা নাটলিপি নির্ভর পরিবেশনা হতে পারে। 'নাট্য' বিষয়ক এই বিশ্লেষণ কেবল বর্তমান কালে নয়, প্রাচীনকালেও এই সংজ্ঞাসূত্রের সমর্থন লাভ করা খুব কঠিন নয়। পাণিনি-এর সময়ে শুধু 'নট' শব্দই নয়, সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন 'নাট্য' শব্দও প্রচলিত ছিল। 'নাট্য' শব্দটির অর্থ হল "নটের কর্ম"।[১] উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ বর্তমান সংজ্ঞাসূত্রের এক বা একাধিক অভিনেতার 'ক্রিয়া' এবং সেকালের নটের 'কর্ম' দুটিই হচ্ছে ক্রিয়াবাচক পদ অর্থাৎ কোনো কিছু করা। অন্যদিকে পতঞ্জলি (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তাঁর মহাভাষ্যে উদাহরণ প্রসঙ্গে কয়েকবারই নটের উল্লেখ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'নট' হচ্ছে একশ্রেণীর পেশাজীবি যারা গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। 'নটস্য গাথাং শৃণোতি'–নটেরা যা গান করত তা হলো পতঞ্জলির ভাষায় 'গাথা'

মিশ্র বিষয় এবং অধিব্যঞ্জনাত্মক পরিবেশনা

এই পর্যায়ের পরিবেশনাসমূহের মধ্যে 'কবিগান' 'পুতুলনাচ', 'লাঠিখেলা' 'পটুয়াগান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের পরিবেশনায় কখনো কখনো আখ্যান নয় বরং বিষয় ও আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার কখনো অভিনেতা বা কুশীলব নয় বরং তার ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী আখ্যান পরিবেশনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

কবিগান: বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র 'কবি লড়াই', 'বিচারগান', 'ভাবগান', 'ছওয়াল জবাব' প্রভৃতি নামে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে গীত, বাদ্য ও কাব্যের সমন্বয়ে যুক্তি-পাল্টাযুক্তির লড়াই বা বিতর্কমূলক পরিবেশনার প্রচলন রয়েছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ এবং সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। শুরুর দিকে কবিগান ধর্মীয় বিষয় দ্বারা পরিবেশিত হলেও, বর্তমানে ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও এই সকল পরিবেশনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। নতুন-পুরান, নারী-পুরুষ, আদম-হাওয়া, নবী-রসুল, রাধা-কৃষ্ণ, এজিদ-হোসেন প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক কবিগান বাংলার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। তবে কবিগানের আবির্ভাব ঠিক কোন সময়ে এই নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে, আঠারো শতকে এর উৎপত্তি ঘটেছে। আবার আরেক শ্রেণীর মতে, ষোল শতকের কোনো এক সময়ে কবিগান উৎপত্তি লাভ করে থাকবে।

এই পরিবেশনায় কোনো সুনির্দিষ্ট আখ্যান বা কাহিনী পরিবেশনের পরিবর্তে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পক্ষে এবং বিপক্ষে দুইজন গায়েন (সাধারণত তাদেরকে কবিয়াল বা সরকার নামে অভিহিত করা হয়) দোহার ও যন্ত্রীদের সহযোগিতায় পরস্পর যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হন। কবিদ্বয় আসরে উপবেশন করে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর একজন কবিয়াল তাঁর পক্ষের যুক্তি প্রদান করে এবং প্রতিপক্ষকে একটি প্রশ্ন করেন। প্রতিপক্ষ কবিয়াল উঠে এসে প্রদত্ত প্রশ্নে উত্তর প্রদান করেন এবং তাঁর পক্ষের যুক্তি প্রদান করেন। এভাবেই সমস্ত উপস্থাপনাটি গীত, কাব্য ও বাদ্যের মূর্ছণায় যুক্তি-পাল্টাযুক্তির তীব্রতায় সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। পরিশেষে, উভয় গায়েন একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যা ধর্মীয় বা সামাজিক শিক্ষামূলক এবং এই শিক্ষা নিয়েই দর্শকগণ পুনরায় যুক্তি-পাল্টাযুক্তিতে বাড়ির পথে মিলিয়ে যায়।

পুতুল নাচ: লোকনাট্য ইতিহাসে পুতুল নাচের একটি প্রাচীন ও সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সুকুমার সেন তাঁর নট নাট্য নাটক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যের উদ্ভবের পেছনে পুতুল নাচের প্রভাব রয়েছে। তিনি আরো মনে করেন যে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যকলার বেশ কিছু নাটকের অংশ বিশেষ পুতুল নাচের মাধ্যমে পরিবেশিত হত। প্রাচীন কালে দেব-দেবীর নিস্পন্দ প্রতিমায় গতিসঞ্চারের মাধ্যমে তাদের কীর্তি-কাহিনী প্রচারের প্রবণতা থেকে পুতুল নাচের জন্ম বলে মনে করেন বাংলাদেশের পুতুল নাচের বিশেষজ্ঞ মুস্তফা মনোয়ারসহ আরো অনেকে। পুতুল নাচের উদ্ভবের পেছনে যা কিছু থাকুক না কেন, ধর্ম আর দেব-দেবীর যোগাযোগকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। আর এই ধর্মীয় সম্পৃক্ততার সূত্রে আজও বাংলাদেশের পুতুল নাচের সর্বশেষ ঐতিহ্য নানান প্রতিবন্ধকতায় টিকে আছে, এমন দাবিও অসংগত নয়। এই যুক্তির পক্ষে বলা যায় যে, আজও পুতুল নাচের জনপ্রিয় নানাবিধ অনুষ্ঠান কাঠামোর মধ্যে দ্বি-চরিত্র বিশিষ্ট রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক অনুষ্ঠান অন্যতম।

বাংলাদেশের পুতুল নাচ বছরের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক উৎসব ও পার্বণ উপলক্ষে বিশেষত, পহেলা বৈশাখ, পৌষমেলা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উৎসব যেমন- ষোলই ডিসেম্বর প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণ এই পুতুল নাচের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং দর্শক। পুতুলনাচ অধিব্যাঞ্জনাত্মক রীতির পরিবেশনা। এখানে অভিনেতা বা কুশীলব আখ্যান উপস্থাপনায় মুখ্য নয় বরং পুতুল মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে কুশীলবগণ পর্দার পেছনে থেকে পুতুল চালনা করে এবং বাচিকাভিনয় বিশেষত বর্ণনা এবং সংলাপের মাধ্যমে আখ্যান উপস্থাপনায় সক্রিয়-অংশগ্রহণ করে। পুতুল নাচিয়েদের সাহায্যে রয়েছে একদল যন্ত্রী ও দোহার যারা গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করে।

পুতুল নাচ

পুতুল নাচের ঐতিহ্যে বেশ কয়েক ধরনের পুতুলের ব্যবহার রয়েছে, যেমন– 'সূত্রপুতুল' (সুতার সাহায্যে চালনা করা হয় যে পুতুল)। ধারণা করা হয়, পুতুল নাচের ইতিহাসে সূত্রপুতুলের অতীত কমপক্ষে তিনহাজার বছরের। বাংলাদেশে সূত্রপুতুল বেশ জনপ্রিয় এবং আজ অবধি প্রচলিত রয়েছে। 'দণ্ডপুতুল' (কাঠি বা সরু দণ্ডের সাহায্যে চালনা করা হয় যে পুতুল)। 'ছায়াপুতুল' এবং 'হস্তপুতুল' (হাত দ্বারা চালিত পুতুল) প্রভৃতি। বাংলার লোকনাট্য চর্চায় কেবল মাত্র সূত্রপুতুল এবং কিয়দাংশে দণ্ডপুতুলের প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল পুতুল নাচের দীর্ঘ অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এমনও বলা হয় যে, পুতুল নাচের চর্চায় শিল্পী, কলাকুশলী এবং কারিগর প্রভৃতির কেন্দ্র এই অঞ্চল।

পুতুল নাচের বিষয় হিসেবে ছোট ছোট কয়েকটি আখ্যান ধারাবাহিক ভাবে পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বা পুরাণ বিষয়াদি যেমন–রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন, রামের বনবাস প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়ে থাকে। পুতুল নাচ পরিবেশনায় পুতুল নাচিয়ে (কুশীলব) সাধারণত সংলাপাত্মক গদ্য এবং গীত-এর মাধ্যমে আখ্যান পরিবেশন করেন। হারমোনিয়াম, ঢোল এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সমন্বিত তালে পুতুলের নৃত্য বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বর্তমানের বাংলাদেশের পুতুল নাচের অতীত ঐতিহ্য অনেকটাই উৎকর্ষহীন হয়ে পড়েছে। পুতুল নাচের প্রদর্শনীতে নৃত্যশিল্পীর যৌন–উত্তেজক নৃত্যের সংযোজন, অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের সম্পৃক্ততা এই শিল্পের উৎকর্ষহীনতার পিছনে একটি কারণ হয়ে থাকতে পারে।

পটুয়াগানঃ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক কুশীলবের কথা জানা যায়, যারা একটি দণ্ডের সাথে মোড়া লম্বা একখন্ড কাপড়ে ধারাবাহিক ভাবে অংকিত আখ্যানভিত্তিক ছবি সুর করে বা কাব্য করে বর্ণনা করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবেশিত এই ধরনের পরিবেশনা সাধারণত 'পটুয়াগান' যা অঞ্চল বিশেষে 'পটের গান' 'পটের কিচ্ছা' প্রভৃতি নামে পরিচিত। পট পরিবেশনায় গায়েন কখনো একা অথবা কখনো দু-একজন দোহারের নৃত্যাভিনয়ের সাথে গীত বর্ণনায় ধারাবাহিক ছবি বিবৃত আখ্যান উপস্থাপন করেন। যারা পটগান পরিবেশন করেন সাধারণত তারা 'পটুয়া' নামে পরিচিত। মধ্যযুগের বাংলা থেকে শুরু করে বিশ শতকের

মধ্যভাগ পর্যন্ত পটুয়াগানের ব্যাপকতা সম্পর্কে জানা গেলেও বর্তমানে পটুয়াগানের দল নেই বললেই চলে। তবে দু-একজন পটুয়ার সন্ধান এখনো জানা যায়, যারা তাদের এই পেশার অস্তিত্বকে বহমান রেখেছে। নরসিংদী অঞ্চলে এইরকম দুজন পটুয়া– দুর্জন আলী এবং কানাই মিঞার কথা জানা যায়। মধ্যযুগের বাংলায় নানা ধরনের পট, যেমন– মনসার পট, গাজীর পট, কৃষ্ণলীলা পট, লক্ষিন্দর ও বেহুলার পট, রামের পট প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তবে বর্তমানে কেবলমাত্র পীর গাজী এবং দেবী মনসার বিষয় ভিত্তিক পটগানের প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়।

উপসংহার

বাংলাদেশের লোকনাট্যচর্চার সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের প্রতি চোখ ফেরালে দেখা যায় যে, এটি একই সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করে স্রোতস্বলা রেখেছে এর বৈচিত্র্যময় ধারা। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত একটি শাখা হিসেবে লোকনাট্য সমসাময়িক পরিবর্তনশীল সমাজ-কাঠামোর মধ্যে থেকেই তার বিবর্তনের পথ খুঁজে নেয়– যা প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং বর্তমানকালের লোকনাট্য চর্চায় লক্ষ্য করা গেছে।

কিন্তু বিবর্তনের এই ধারার মধ্যখণ্ডনকারী হিসেবে ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনামল (১৭৫৭-১৯৪৭) লোকনাট্যচর্চায় ভিন্নমাত্রিক একটি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজরা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ নিশ্চিত করতে নগর সংস্কৃতিতে 'বাবু' নামে ইংরেজমনস্ক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত একশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায় গড়ে তোলে। এই শ্রেণীমনস্ক বাবুগণ তাদের চিন্তা, কর্মে এমনকি স্বপ্নেও ইংরেজ হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। নগর সংস্কৃতিতে গড়ে উঠতে থাকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যা ইংরেজি শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। মূলত ব্রিটিশরাজ তার সামাজিক শক্তিকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়েই সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে শুরু হয় 'হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং মুসলিম ব্রাহ্মণ্যবাদ (আশরাফ আতরাফ মোল্লাকি) অভ্যুত্থান'।[৩৯] একদিকে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ভিত্তিক সামাজিক বিভাজন অন্যদিকে ইংরেজ-মনস্ক এই নব্য বাবু শ্রেণীর ইংরেজি শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি ও পৃষ্টপোষকতার কারণে দীর্ঘদিনের বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একক ও সুসমন্বিত ধারাটি ক্রমান্বয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। যার ফলস্বরূপ স্থানীয়, দেশজ নাট্যচর্চায় স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ রুদ্ধ হয়ে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা এবং লোকনাট্যচর্চা– 'শহুরে ও গ্রামীণ' এই দু'টি বিভক্ত ধারায় বিকশিত ও প্রবাহিত হতে থাকে।

ঔপনিবেশিক যুগের অবদান হিসেবে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর আদলে নাটক রচনা এবং পরিবেশনা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'দ্য নিউ প্লে-হাউজ' (১৭৭৬ সন), চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৩৯), সাঁ সুসি থিয়েটার (১৮৩৯-৪৯) সহ বেশকিছু থিয়েটার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংরেজি নাট্যচর্চার তীর্থভূমি হিসেবে বিলেত এবং উপাস্য হিসেবে শেক্সপীয়রকে এমনই গুরুত্ব ও সম্মান প্রদান করা হল যার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন কলকাতাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায়। ১৮৩১ সালে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তাঁর "হিন্দু থিয়েটার" উদ্বোধন করেছিলেন শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের পঞ্চম অংক এবং সংস্কৃত নাটক ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র প্রথম অংক ভাষান্তরিত ইংরেজি নাট্যরূপের মঞ্চায়নের দ্বারা যা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর আদলেই পরিবেশিত হয়। ইংরেজি থিয়েটারচর্চার ধারা এতই প্রবল ছিল যে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন 'দ্য পারসিকিউটেড'। কিছু গবেষক দাবি করেন, ইউরোপীয় নাট্যঠামোর আদলে নাটক রচনার এটিই প্রথম এদেশীয় উদ্যোগ।[৪০] সেই থেকে বাংলার শহরকেন্দ্রিক থিয়েটার চর্চার মূলধারাটি ঔপনিবেশিক আমলের আমদানি করা বিলেতি নাট্যকাঠামো এবং উপনিবেশ পরবর্তী ৫০-এর দশকের কলকাতায় গড়ে ওঠা 'গ্রুপ থিয়েটারচর্চা' (পেশাজীবী নাট্যচর্চা ও শৌখিন নাট্যচর্চা এই দুই ধারার বিকল্প হিসেবে তৃতীয় একটি ধারা-গ্রুপ থিয়েটার) দ্বারা প্রভাবিত, যা অদ্যাবধি সক্রিয়। ঢাকার নাট্যচর্চা সম্পর্কে এমনও শোনা যায় যে-'পাশ্চাত্য নকল থিয়েটারের পীঠভূমি কলকাতা। আর কলকাতার নকলের পীঠভূমি ছিল ঢাকার থিয়েটার। এ ব্যাপারে এখানে মৌলিকত্ব বলতে কোন কিছুই ছিল না। না জেনে না বুঝে নকল। পরিকল্পনা, মঞ্চস্থাপত্য-এ সবের কোন ধার ধারা হতো না। নকলের নকল যা হয় তাই।'[৪১] স্বভাবতই

এই থিয়েটারচর্চা বৃহত্তর জনজীবনের চাহিদাকে উপেক্ষা করে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে শহুরে মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তদের চাওয়া-পাওয়া আর স্বপ্ন বাস্তবায়নের শিল্প সাধনায়।

এ সব সত্ত্বেও শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় আরও একটি ভিন্ন ধারায় ক্ষীণ আকারে হলেও নাট্য নির্মাণে স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যের রঙ, রূপ, রস ও আঙ্গিকের সাথে সমসাময়িক নাট্যচিন্তা ও বিষয়ের সমন্বয়ের সচেতন প্রয়াস-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ঔপনিবেশিক শাসনামলের (আঠারো শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশক) নাট্যচর্চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সহজ প্রবেশাধিকার না থাকায় শহর পর্যায়ে স্থানীয় নাট্যকলার নাটগীত রীতির জনপ্রিয়তা তখনও বিদ্যমান থাকে। ১৮৩৫ সালে নবীন চন্দ্র বসুর বাড়িতে অভিনীত নাটক 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মঞ্চায়ন নাটগীত রীতির জনপ্রিয়তাকেই প্রমাণ করে। সাধারণ শহুরে বাঙালি দর্শকের সম্মুখে অভিনীত নারী ও পুরুষ অভিনয়শিল্পী দ্বারা পরিবেশিত এই নাটক ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

উপনিবেশ প্রভাবজাত নাট্যচর্চার বিপরীতে মধ্যযুগে বিকশিত নাটগীতরীতি থেকে 'কৃষ্ণযাত্রা' যা পরবর্তী পর্যায়ে 'যাত্রা' নামে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে এবং ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই যাত্রা পরিবেশনায় ইউরোপীয় নাট্য নির্মাণ কাঠামোর দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য অনুষঙ্গের প্রবেশ ঘটে। মিলন-বর্জনের এই ধারাবাহিকতায় নাটগীত রীতি বা যাত্রার সাথে ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর সংশ্লেষ ও সমন্বিত রূপায়ণই বর্তমান বাংলার যাত্রা পরিবেশনারীতি যা আজও বর্তমান।

১৮৬০ সালে দিকে মনমোহন বসুর উদ্যোগে ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর বিপরীতে নাটগীতরীতি বিশেষত যাত্রা থেকে উদ্ভব ঘটে নতুন এক নাট্যপ্রকরণ যা 'গীতাভিনয়' নামে প্রচুর সাড়া পায়। মূলত স্থানীয় নাট্যরীতি বা যাত্রা-কাঠামোকে আরো উন্নত রূপদান করা হয় এই গীতাভিনয়ের মাধ্যমে। 'নাটগীত রীতি'র ন্যায় গীতাভিনয়ে ভক্তিমূলক ও করুণ রসাশ্রয়ী ভাবাবেগের প্রতিই জোর দেয় বেশী।[৪২]

ঔপনিবেশিক শাসনামলের শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮১-১৯৪১)। তাঁর প্রথম দিককার বেশ কিছু নাটকে ইউরোপীয় নাট্যকাঠামো অনুসৃত হলেও পরবর্তীকালে তার প্রায় সকল নাটকেই স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্যের সাথে ইউরোপীয় নাট্যঐতিহ্য-অনুষঙ্গ সমন্বয়ের সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'নন্দিনী' ও 'অমল' এসেছে নাটগীত-এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ধরে এবং তারা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় নিজেদের অস্তিত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট– যেমন করেছে বেহুলা, কৃষ্ণ ও ইমাম হোসেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা ও ডাকঘর-এ ঠার্কুদা এবং অচলায়তনে– দাদা ঠাকুর যাত্রানুষ্ঠানের 'বিবেক' ও 'বাউল' চরিত্রদ্বয়ের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।'[৪৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য বিশেষ করে চণ্ডালিকা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি রচনার সাথে বাংলার স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যের নৃত্য-গীতবহুল নাটগীত রীতির সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় সম্পর্কের বিষয়টি আজ সর্বজন স্বীকৃত।

শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সাথে স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যের সমন্বয়ে স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তক মুকুন্দ দাস (১৮৭৯-১৯৩৫) এবং কবিয়াল রমেশ শীল (১৯০৭-১৯৬৭) অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা উভয়ে স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য 'যাত্রা' এবং 'কবিগানে'র ধর্মীয়, পৌরাণিক এবং সাধু-সন্নাসীদের বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার বিপরীতে রাষ্ট্রীয় শোষণ ও শাসন কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্বদেশীযাত্রা এবং কবিগান। মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশী যাত্রার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষন, দেশপ্রেম, বর্ণপ্রথা, সামন্ত নির্যাতন-প্রতিবাদ-সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়যুক্ত যাত্রানুষ্ঠান জনগণের মাঝে অদম্য নিষ্ঠার সাথে পরিবেশন করেন। অন্যদিকে, কবিয়াল রমেশ শীল শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে– পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্র অথবা বুর্জোয়া সংস্কৃতি বনাম গণসংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় কবি লড়াইয়ের মাধ্যমে ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তার সাথে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন।

ইংরেজ পরবর্তী পাকিস্তান শাসনামলের বাংলার নাট্যচর্চায় পল্লীকবি জসিমউদ্দীনের নাম উল্লেখ করা যায় যিনি গ্রামীণ জীবন–উপাদান ও আখ্যান নির্ভর নাটক রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাটকে জনপ্রিয়

লোককাহিনী, সংগীত ও নৃত্যসহ নানাবিধ গ্রামীণ উপাদান ব্যবহারের কারণে তিনি সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যে জনপ্রিয় কবি হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেন।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে, ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী বাংলার শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার মূলধারাটি মূলত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংগ্রাম এবং আদর্শ বাস্তবায়নে পরিপূর্ণ। তবে আশি ও নব্বই দশকে পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে বাংলার শিল্প ও সাহিত্যাঙ্গনে আবহমান বাংলার সমন্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্বেষণ, সংরক্ষণ এবং সংস্কৃতির মূলানুগ হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি জোরালো হতে থাকে। এইরূপ পরিস্থিতিতে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় বিশেষ করে ঢাকার নাট্যচর্চায় 'শেকড় সন্ধানী নাটক', 'দেশজনাট্য রীতি', 'জাতীয় নাট্যাঙ্গিক', 'বাঙলা নাট্যাঙ্গিক' প্রভৃতি নামে বাংলার স্থানীয় নাট্যকলা ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্য ধারার নাট্য অনুষঙ্গের সমন্বয় ও প্রয়োগ-প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ের নাট্যাঙ্গনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নাট্যকলার প্রতিষ্ঠা যেখানে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির পাশাপাশি দেশজ বা স্থানীয় নাট্যকলার ঐতিহ্য অন্বেষণ ও চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ হয় এবং নাট্যকলা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বেশ কিছু সংখ্যক নাট্যকর্মীর নাট্যাঙ্গনে সক্রিয় বিচরণ লক্ষণীয় অবদান রাখে। নাট্যচিন্তা ও দর্শনের এইরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় নির্দেশক সৈয়দ জামিল আহমেদ এমনই এক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে ব্রতী হলেন যে, 'কোথায় দাঁড়ালে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক চাহিদা ছুঁয়ে যাওয়া যায়? 'একটি সাধারণ জমিন'-বাংলার সমন্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মৌল উপাদান ব্যবহার করে এমন এক সামগ্রিক জীবন দর্শন নির্মাণ করা কি আদৌ সম্ভব, যেখানে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন জীবনের অবচেতন স্তরে হলেও একে এক আদর্শ হিসেবে মান্য করে থাকে, ছোঁয়া না ছোঁয়ার উপরই দাঁড়ায় যে জীবনের অর্থ।'[৪৪] আবার ড. সেলিম আল দীন লোকনাট্যের 'বর্ণনাত্মক' রীতির গুরুত্ব ও সম্ভাবনাকে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' শিল্প তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করে বলেন- দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বে একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে একের লীন হবার দৃষ্টান্ত রূপে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য থেকে প্রভূত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়। ধরা যাক পাঁচালি, এ একই সঙ্গে নাট্য, নৃত্য, গীত, কৃত্য, কথা, কাহিনী, উপাখ্যান, রাগরাগিনীর বিচিত্র সঞ্চয়, তার একদেহে যেন নিখিলের সমস্ত বৈচিত্র, এক অবিভাজ্য স্বর্ণ-সঙ্কেতে জ্বলজ্বল করে।'[৪৫] মূলত এই সকল নাট্যদর্শনের প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় বিশেষত ঢাকাস্থ নাট্যচর্চার বেশকিছু নাট্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানীয় নাট্যকলা বা লোকনাট্যকলার প্রতি সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং তৎপরবর্তী নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়ার ধারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকে দেশীয় নাট্যকলার ঐতিহ্যের ব্যবহার এবং সমকালীন বাস্তবতায় এর সম্পর্ক বিনির্মাণের প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ধারাবাহিকতায় ঢাকার নাট্য মঞ্চে ঢাকা থিয়েটারের-চাকা,বনপাংশুল; ঢাকা পদাতিকের-বিষাদসিন্ধু; সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটারের-ভেলুয়া সুন্দরী; আরণ্যকের-সংক্রান্তি; জিয়নকাঠি: সন্ধানে ক্রমসৃজ্যমান নাট্যদলের-আবহমান বাংলা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের-কমলারাণীর সাগর দীঘি, বেহুলার ভাসান; কুষ্টিয়া বোধন থিয়েটারের-শুরু করি ভূমির নামে; মণিপুরী থিয়েটারের-শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন; জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ- দেওয়ানা মদিনা; ফরিদপুর থিয়েটারের-কাজলরেখাসহ বেশ কিছু নাটকের মঞ্চায়ন দর্শকপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। পাশাপাশি আদিবাসী সংস্কৃতি ও বিষয় সম্বলিত নাট্যচর্চার একটি ধারাও বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন- ঢাকা থিয়েটারের-একটি মারমা রূপকথা, আরণ্যক নাট্যদলের-রাঢ়াঙ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাট্য নির্মাণে লোক নাট্যকলার বিষয়, আঙ্গিক ও উপাদানের সহজাত শক্তির সাথে নাগরিক জীবন ছুঁয়ে যাওয়ার সচেতন প্রচেষ্টা এসবকে করেছে সমকালীন।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের লোকনাট্যচর্চায় জনজীবনের মানবিক চাহিদাই এর শক্তি। ধর্ম সে জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। কেননা সমাজবদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম। "[H]uman beings have created cultural objects that are religious in nature."[৪৬] সুতরাং লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে লোকনাট্যের বিকাশ ও বিবর্তনের মূলে ধর্মের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এ কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা

রাখে না। তবে 'বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মগুলোর কোনোটাই যার যার উদ্ভবকালে সম্পূর্ণ অভিনব কিছু ছিল না। প্রতিটি ধর্ম পূর্ববর্তীকালের সামাজিক জীবনের স্মৃতি নানা উপকথা ও কাহিনীরূপে আত্মীকৃত করে আত্মপ্রকাশ করেছে।'[৩১] তাইতো উন্মুক্ত আসরে গায়েনের কণ্ঠবাহিত সুর-ছন্দের দোলায় ধর্ম আর সমাজ জীবনের সম্মিলিত অথচ সমসাময়িক ব্যাখ্যাই যেন দর্শকের শিল্পরস আস্বদনের খোরাক হয়ে ওঠে। রামায়ণ গানে সীতা ও লব-কুশের ঘটনাংশে মা ও সন্তানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে আসরের গায়েন ছুটে বেড়ান কোরান, বাইবেল আর গীতায় বর্ণিত পথে। সুর আর ছন্দের দোলায় তিনি যেন একটি কথাই বার বার করে বলতে চেয়েছেন, মানব কল্যাণে সকল ধর্মই এক। সেখানে ধর্মের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা তৈরির হিংস্র প্রবণতা অসার প্রচেষ্টা মাত্র।

লোকনাট্যের আখ্যানে ধর্মীয় ব্যাখ্যাই সর্বত্র প্রাধান্য পেয়েছে বিষয়টি এমন নয় বরং ধর্ম, কৃষি, অতিলৌকিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের সমাহার থাকলেও মানবিক অনুভূতির প্রকাশ কোথাও এতটুকু যেন ক্ষুন্ন হয় না বরং এর তীব্রতা হয়েছে কোথাও কম অথবা বেশি। ধর্ম নয় বরং মানবীয় গুণাবলী আর মানব-মানবীর উদার সম্পর্কের জোরাল উপস্থিতিই মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র আখ্যান বা পালাগুলোতে। তবে ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও এ সকল আখ্যানের শুরুতে দেব-দেবী, আল্লা-রসুল পীর-আউলিয়ার উদ্দেশ্যে বন্দনাগীতের মাধ্যমে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করায় পরিবেশনার সাথে ধর্মের সংশ্লিষ্ঠতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে গীতিকার একটি বন্দনাগীতের উদ্ধৃতিতে তাই দেখা যায় আল্লা, নবী আর দেব-দেবীর অপূর্ব সহাবস্থান। যা মূলত গ্রাম বাংলার সাধারণ জীবনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর মিলন মেলার চিত্রকে বর্ণনা করে।

আমি আর কারে ডাকিবো গো
এসো গো মা সরস্বতী।
প্রথমে আল্লাজীর নামে আমি লেখা করলাম শুরু।
তারপরে বন্দনা করলাম নবীজীর চরণ॥
পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় হয় গো চৌদিকে পশর।
পশ্চিমে বন্দনা করলাম কাবা বড় স্থান।
যেখানে ছাপাইছিল আল্লায় কিতাব ও কুরান॥
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত।
যেখানে ছাপাইছিল আল্লায় আলী মালামের পাথর॥
দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীরনদী সাগর।
যেখানে বাণিজ্য করে চাঁদ সওদাগর॥

তথাপিও 'ধর্ম' নাকি 'শিল্প'– লোকনাট্যের লোকপ্রিয়তায় প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে? এই প্রশ্নের পক্ষে বা বিপক্ষে জোরাল যুক্তি সত্ত্বেও উভয়কেই একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক সাদৃশ্য সূত্রে চিহ্নিত করা যায়–আর সেটি হচ্ছে 'সামাজিক গুরুত্ব'। অর্থাৎ শিল্প ও ধর্ম উভয়ের একটি সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে যা একদল মানুষকে সম্মিলিত চর্চায় আবদ্ধ করে। বোধহয় এ কারণেই হাড় কাঁপুনে শীতের কুয়াশাভরা কনকনে রাতে বারবার দেখা কিচ্ছাগানের আসরে আর একবার ছুটে যেতে অথবা ধর্মসভায় বসে থাকতে এতটুকু ক্লান্তি হয় না কারো। আর এই দুটি বিষয়ের রস আস্বাদন যখন কোনো একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশনার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব হয় তখন এই পরিবেশনাটিই হয়ে ওঠে দর্শকের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের শৈল্পিক মাধ্যম।

তাই লোকনাট্য পরিবেশনার বিষয়, ভাব ও দর্শনের নিত্য পরিবর্তন, গ্রহণ-বর্জন-আত্মীকরণ সবকিছুই যেন লোকসমাজ তাদের জীবনাচার ও জীবনকাঠামোকে রঙিন কাগজের নক্সায় তৈরি আসরের মাঝে প্রতিবার নতুন করে চিত্রিত করেছে, সমালোচনা করেছে আবার বলেছে পরিবর্তনের কথা। এ যেন তাদেরই জীবনসংগীত যেখানে

দর্শক অভিনেতা একাকার হয়ে যায় সর্প দংশনে বেহুলার ক্রন্দনে, মহুয়ার আত্মত্যাগে আঁৎকে উঠে তাকায় নিজেরই দিকে, সং-যাত্রার শ্লেষ যেন নিজেদের আরো একবার পরিশুদ্ধ করে তোলে। জারিগানে কারবালার বিষাদময় সুর–ছন্দ আর নৃত্যের দোলা যেন সমগ্র জাতির হৃদয় নিংড়ানো মানবিক ছন্দের বহির্প্রকাশ। আর রামায়ণগানের আসরে সকল ধর্মের মূল সুর তাই এক হয়ে মহান করে মানুষকে, সুর তোলে সম্প্রীতির। লোকনাট্য যেন তাদেরই জীবন তাদের মতো করে বারবার দেখা চিরচেনা অথচ প্রতিবারই নতুন করে দেখা আর এক পৃথিবীর শিল্পরূপময় আয়না।

টীকা:

১. সুকুমার সেন: নট, নাট্য, নাটক, পৃ. ১১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য: লোকনাট্য, সৈকত আসগর সম্পাদিত, বাংলার লোকঐতিহ্য: লোকনাট্য থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১২১।
৪. সেলিম আল দীন: মধ্যযুগের বাংলা নাট্য, পৃ. ২।
৫. মোহাম্মদ সাইদুর: লোক সাহিত্য সংকলন-১৪১, পৃ.৭।
৬. মযহারুল ইসলাম: বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, পৃ. ৩৬।
৭. সুকুমার সেন: নট নটী নাটক, পৃ. ১৪।
৮. বরুণ কুমার চক্রবর্তী: বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পৃ. ২৭৯।
৯. সেলিম আল দীন: মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, পৃ. ৩।
১০. Syed Jamil Ahmed: Acinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh, P.18
১১. প্রাগুক্ত।
১২. গোলাম মুরশিদ: হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃ. ১৭।
১৩. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত): ভরত নাট্যশাস্ত্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. সৈয়দ জামিল আহমেদ: হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, পৃ. ২।
১৬. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.৪০৮।
১৭. সৈয়দ জামিল আহমেদ: হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, পৃ. ৩।
১৮. হুমায়ুন আজাদ: লালনীল দীপাবলী, পৃ. ১৭।
১৯. আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত: চর্যগীতিকা, পৃ. ১০৭-১০৮।
২০. আহমদ শরীফ কর্তৃক উদ্ধৃত সুকুমার সেনের আলোচনা থেকে গৃহীত: বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সাহিত্য সৃষ্টি (১৯০৭) 'সাহত্যি সৃষ্টি' প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।
২২. শান্তিময় ঘোষাল: বাংলার লৌকিক সাহিত্যে রাম ও ভারত-কথা, পৃ. ৪।
২৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ১০৯।
২৪. সাইমন জাকারিয়া: প্রণমহি বঙ্গমাতা, পৃ. ৫১।
২৫. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন: হারামনি (২য় খণ্ড), বাঙলা একাডেমী, পৃ. ৫১।
২৬. সৈয়দ জামিল আহমেদ: হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, পৃ. ১৬।
২৭. সেলিম আল দীন: মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, পৃ. ১৭০।
২৮. সৈয়দ জামিল আহমেদ: হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, পৃ.১৭।
২৯. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা মঙ্গলকাব্যে ইতিহাস, পৃ.১১।
৩০. সৈয়দ জামিল আহমেদ: হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা, পৃ. ১২।
৩১. আশুতোষ ভট্টাচার্য: মঙ্গলকাব্য, পৃ. ১৪।
৩২. প্রদ্যোত ঘোষ: লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৫৬, ৬৮-৭১।
৩৩. সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ.৪১১।

অর্থাৎ নটের গান শুনছে।'[২] এখানে কেউ গান করছে এবং কেউ শুনছে আর এভাবেই নটকর্ম সাধিত হচেছ বলে সহজেই অনুমান করা যায়। পতঞ্জলির এই ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই ড. সুকুমার সেন মনে করেন, মধ্য ও আধুনিক বাংলায় যাকে 'নাট' বলা হয়, তা-মূলত এসেছে সংস্কৃত 'নাট্য' থেকে। সুতরাং 'নাট্য' শব্দের ব্যাখ্যায় দর্শক, অভিনেতা, অভিনয়স্থান এবং ক্রিয়া-এইসকল পূর্বশর্তের ওপর নির্ভর করে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লোকনাট্যের সংজ্ঞা, উৎস, ধারা ও রীতিসমূহের একটি সুনির্দিষ্ট পথে আলোচনা করা সম্ভব।

লোকনাট্যকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সাথে যুক্ত করে বলা যায় যে–'গ্রামীণ সমাজের জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তা-ই লোকনাট্য।'[৩] এই জাতীয় নাট্যের বিষয় ও নাট্যরীতির উদ্ভব প্রসঙ্গে বলা হয় যে–'আমাদের লোকজীবনের কৃত্য ও রুচিকে অবলম্বন করেই নাটকের এক একটি বিষয় ও নাট্যরীতির জন্ম হয়েছে।'[৪] লোকনাট্য কেবলমাত্র লোকসাহিত্য আলোচনার একটি অধ্যায় নয়, বরং দৃশ্যকাব্য বা কলা হিসেবে এই নাট্যের একটি সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে, কেননা এ জাতীয় নাট্য পরিবেশনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি এবং এর সকল কুশীলব সমাজের অভ্যন্তর থেকেই বিকশিত হয়। 'এখানে লোকনাট্যকলা বলতে এমন এক জাতীয় গীতাভিনয় ও অভিনয় কলার কথা বলা হয়েছে–যে কাহিনীর রচক, গীতাভিনয়ের দর্শক, শ্রোতা, কলাকুশলী, পাত্র-পাত্রী থেকে নর্তক-নর্তকী, গীতক-বাদক সবাই পল্লীর নিরক্ষর এবং সাধারণ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকসমাজ। এ জাতীয় কাহিনী-কলার অভিনয় বা নাটকীয় কোন ফর্ম বা লিখিত রূপ নেই। প্রাচীনকাল থেকেই এ কলার বিভিন্ন কাহিনী ও রূপ সাধারণ মানুষের স্মৃতি ফলকে রক্ষিত হয়ে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সে দিক থেকে এ কলা যেহেতু সাধারণ লোকসমাজে উদ্ভুত ও সাধারণ লোক সমাজেই এর ব্যাপ্তি সুতরাং একে 'লোকনাট্যকলা' বলাই শ্রেয়।'[৫] তাহলে লোকনাট্যকলার স্রষ্টা সাধারণ জনগণ, জনগণই তাদের লালন করে, জনগণই এ নাট্যকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বা দেশে বহন করে। লোকনাট্যচর্চা ও পরিবেশনায় দর্শকেরও রয়েছে জোরালো আত্মিক যোগাযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা। 'শ্রোতাদের বা দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, যেমন–হাসি, সমর্থন, বিরূপ প্রতিক্রিয়া, সমালোচনা, বর্ণনাকারী বা পরিবেশনকারীকে প্রেরণাদান, গানে যোগদান, আনন্দে নেচে উঠা অথবা কাহিনী বর্ণনার সময় সেই কাহিনীর ভূমিকায় অভিনয় শুরু করা ইত্যাদি।'[৬] বাংলাদেশের লোকনাট্য বিষয়ের এই আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে এর কতগুলি সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে।

ক. লোকনাট্য গ্রামীণ জন সাধারণের দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছেই পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা (মৌখিক ও লিখিত), কলাকুশলী ও দর্শক সকলেই গ্রামীণ বা লোকায়ত স্তরের মানুষ।

খ. শহরকেন্দ্রিক অভিজাত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব–মুক্ত গ্রামীণ জানপদের মাঠ, ঘাট, হাট, মন্দির বা খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত আঙ্গিনায় অথবা বারোয়ারীতলায় এই নাট্যের উদ্ভব ও পরিবেশনা দেখা যায়।

গ. লোকনাট্য শিল্পশাসনের সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়মে আবদ্ধ থাকে না। এর আঙ্গিক, বিষয় ও পরিধি নিত্য পরিবর্তনশীল। সমাজের মৌলিক মানবিক চাহিদা ও দর্শক রুচি অনুসারে এ জাতীয় নাট্যের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটে থাকে।

ঘ. নির্দিষ্ট কিছু বিষয়–বিশেষত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় ব্যতীত অধিকাংশ লোকনাট্যের বিষয়বস্তু ধর্মভিত্তিক। ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মানবিক ও সামাজিক রীতিনীতির প্রাধান্য থাকলেও ধর্ম ও ধর্ম ভিত্তিক নীতি-অনুশাসন আদর্শ হিসেবেই সর্বজনমান্য হিসেবে জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঙ. লোকনাট্যের আখ্যান শুধুমাত্র সংলাপ প্রধান নয়, বরং বর্ণনা, সুর, সংগীত ও নৃত্যের প্রাধান্য প্রায় সমভাবেই বিরাজমান থাকে।

চ. লোকনাট্যের আখ্যান পরিবেশনায় কলাকুশলীই একমাত্র নয়, কখনো কখনো কুশীলব ছাড়াও অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে মুখোশ, পট বা পুতুলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং লোকনাট্য বলতে সেই সকল নাট্যকে গ্রহণ করা হচেছ, যা ক্রমবিবর্তনের ধারায় শহরকেন্দ্রিক শিক্ষা সংস্কৃতির বাইরে অবস্থিত অক্ষরজ্ঞানহীন এবং অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন দেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জনগণ তাদের স্থানীয় রুচি, কৃত্য, ধর্ম, ভাষা বৈচিত্র্যের দ্বারা সৃষ্ট এবং পরিবর্তিত সমাজিক প্রেক্ষাপটে নানাবিধ ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রহণ, বর্জন, সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে রয়েছে দুটি ধারা– ক. মৌখিক রীতি, যা মুখে মুখে রচিত ও তদানুসারে পরিবেশিত নাট্য; এবং খ. কবির রচিত নাটলিপি অনুসৃত পরিবেশনা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকনাট্য নৃত্য, গীত ও কথার দ্বৈতাদ্বৈত শিল্প–নির্ভর পরিবেশনা। আর সে কারণেই লোকসংস্কৃতির ধারা হিসেবে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যেও নাট্যধর্মী এমন অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা লোকনাট্যের আলোচনাতেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে শুরুতেই বলা যেতে পারে যে, 'আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকর্ম ও নৃত্যকর্ম স্বতন্ত্র পথ নিতে শুরু করেছে। কিন্তু লোক-ব্যবহারে– সেদিন অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত -"নাট" ও "নাচ" অনেক সময়ে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।'[৭] লোকআখ্যান পরিবেশনায় নৃত্য ও নাট্যের পারস্পরিক সহাবস্থানের রীতি কেবল মধ্যযুগে নয়, বর্তমানেও এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত লাভ করা যায়, যা থেকে নৃত্য ও নাট্য-কে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। বাংলাদেশের লোকনাট্য নিরবলম্ব সংলাপ প্রধান নয়–সুর, সংগীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয় হচ্ছে এই অঞ্চলের লোকনাট্য আখ্যান পরিবেশনের মূল ঐকতান। রাসনৃত্য, মুখানাচ, কালীকাচ, গোমিরা নাচ, শিব-গৌরী নাচ, বেইল্ল্যা নাচারী, পদ্মার নাচন, নাইচের জারি প্রভৃতি পরিবেশনার নামকরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সকল নৃত্য প্রধান পরিবেশনা। মধ্যযুগের কাব্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন অবলম্বনে পরিবেশিত জনপ্রিয় একটি রীতি মণিপুরী 'রাসনৃত্য'। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা রাতে 'মহারাস' উৎসবের এই পরিবেশনায় কৃষ্ণ প্রেম নিবেদনার্থে বৃন্দাবনে রাধা ও গোপীদের সাথে যে–নৃত্যের আঙ্গিকে আখ্যান পরিবেশন করা হয়, তাই মণিপুরী 'রাসনৃত্য' নামে পরিচিত। কৃষ্ণের লীলা নামের এই আখ্যান উপস্থাপনায় নৃত্য মুখ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, শক্তির উপাসক শিব ও কালীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভক্তি প্রদর্শনমূলক পরিবেশনা; মুখানাচ, কালীকাচ, গোমিরা নাচ, শিব-গৌরী নাচ প্রভৃতি পরিবেশনায় চরিত্রের উপস্থাপনা, গীত ও ছন্দময় আঙ্গিকাভিনয় সবকিছুই যেন নৃত্যের রঙিন নক্সায় অঙ্কিত। মধ্যযুগের আর একটি জনপ্রিয় নাটলিপি 'মনসামঙ্গল' অনুসৃত বেইল্ল্যা নাচারী, পদ্মার নাচন প্রভৃতি, অনার্য দেবী মনসার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রকাশার্থে নৃত্যপ্রধান উপস্থাপনা। সর্পদেবী মনসা বিষয়ক নানাবিধ পরিবেশনার মধ্যে এই দুটি পরিবেশনা আজো বাংলার গ্রামগঞ্জে পরিবেশিত হয়। এছাড়াও নাথ ধর্মের পরিবেশনা 'গায়েনের নাচ', ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন, হানিফা, আমির হামজা প্রভৃতি মুসলিম বীরদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'নাইচের জারি' প্রভৃতি পরিবেশনার আখ্যান বা কাহিনী পরিবেশনায় নৃত্য যেন এক শৈল্পিক কাঠামোয় ক্রিয়াশীল।

অন্যদিকে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় কারো কারো দাবি এইরূপ যে, 'বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণ হল সঙ্গীত। অন্যভাবে বলা যায় যে, সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির ওপরই বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাসাদটি অবস্থিত।'[৮] বাংলাদেশের লোকসংগীত-এর আলোচনায় তাই লোকপর্যায়ে পরিবেশিত সংগীত নির্ভর এবং সংগীতের অংশগ্রহণমূলক যাবতীয় পরিবেশনারীতিকে লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর (১৩৭৩-১৩৭৪) ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত বাংলা লোকসংগীতের এই কোষগ্রন্থে বঙ্গীয় লোক সংগীত হিসেবে অসংখ্য সংগীতের মধ্যে অষ্টক, গাজীর গান, ঝাঁপান গান, ধর্ম পূজার গান, নাটগীত, ধুয়া গান, ঝুমুরগান, পাঁচালি, ভাসান গান, যাত্রা গান, রামায়ণগান, কাচ নৃত্য, গম্ভীরা নাচ, বনবিবির গান প্রভৃতি রীতির উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায় যে, এই সকল সংগীত নিছক সংগীত নয়, এগুলো নাট্যগুণ যুক্ত। অর্থাৎ এখানে ইতিবৃত্ত বা আখ্যানের বিন্যাস পদ্ধতি, আখ্যানের বিভিন্ন চরিত্রে কুশীলবদের অংশগ্রহণ, যন্ত্রী ও দোহারদলের অংশগ্রহণ, চরিত্রের প্রবেশ–প্রস্থান এবং উপস্থাপন আঙ্গিকের কারণে তা নাট্যের আলোচ্য পরিধিরও অন্তর্ভূক্ত বিষয়। এক্ষেত্রে গম্ভীরার কথা বলা যেতে পারে। যেমন অধিকাংশ আলোচনায় গম্ভীরাকে 'গান' হিসেবে দেখলেও, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'লোকসঙ্গীত রত্নাকর'-এর ৪র্থ খণ্ডে 'গম্ভীরা নাচ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গম্ভীরা

গানে কুশীলবদের শিব, পার্বতী প্রভৃতি চরিত্রে অংশগ্রহণ, দোহার ও যন্ত্রীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ছাড়াও উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নানা অভিনয়ে অংশগ্রহণ এবং আখ্যানে নাটকীয়তা থাকা সত্ত্বেও ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী গম্ভীরা গানকে লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত না করে লোকসংগীতের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত পরিবেশনাগুলোতে নৃত্য ও গীতের মুখ্য ভূমিকা এবং সেই অনুসারে পরিবেশনারীতির নামকরণ সত্ত্বেও এই সকল পরিবেশনায় সংলাপ এবং উক্তি-প্রত্যুক্তির উপস্থিতি, কুশীলবের চরিত্র-নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, দ্রব্য সামগ্রির (প্রপস্) ব্যবহার, আখ্যান বা কাহিনীর গতিময়তাসহ অন্যান্য নাট্যগুণের উপস্থিতির কারণে তা নাট্যও বটে। 'বাঙলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক সহস্র বৎসরের ধারায় বাহিত হয়েছে কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহমনে অদ্বৈতের ঝঙ্কার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ–তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেই বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে।'[৯] সুতরাং বাংলা নাট্য পরিবেশনার রীতি, বৈচিত্র্য ও পরিধিকে নিছক সংলাপ নির্ভর কতিপয় আখ্যানাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলে, এর প্রকৃত রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়। বাংলা নাট্যের দ্বৈত-অদ্বৈত শিল্পশক্তির প্রয়োগে নাট্য নিছক নাট্য নয়, তা একাধারে নৃত্য-গীত-কথার এক অপূর্ব শিল্পরূপও বটে। যদি বাংলার নাট্য ঐতিহ্যকে এইরূপ শিল্পআঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়, তবেই বাংলাদেশের লোকনাট্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করা সম্ভব।

বস্তুত তিনটি অঙ্গ, যথা–নৃত্য, সংগীত এবং কথার একক বা সমষ্টিগত উপাদানের প্রয়োগে লোকনাট্যের প্রায় সকল আখ্যান পরিবেশিত হয়ে থাকে।[১০] 'কথা' বলতে অভিনেতার কণ্ঠ উচ্চারিত বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয়কে বোঝানো হয়েছে। লোকনাট্যে কুশীলবগণ মূলত বর্ণনা অথবা সংলাপ অথবা এ দুয়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে নির্ধারিত একটি আখ্যান উপস্থাপন করে থাকেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক বা সংলাপাত্মক উপাদানের সাথে পুতুল, মুখোশ, পট প্রভৃতি মূকাভিনয়মূলক উপাদান ব্যবহার করে থাকেন। বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি অভিনয় উপাদান যথা–গদ্য, গীত এবং কাব্য (আখ্যানাংশের অন্ত মিল ছন্দযুক্ত অভিনয়কে কাব্যাভিনয় বলা হয়েছে অর্থাৎ ছন্দযুক্ত পরিবেশনা যা কাব্যিক ছন্দে পরিবেশিত হয়) যা সাধারণত গদ্যাভিনয়, গীতাভিনয় এবং কাব্যাভিনয়ের আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই সকল অভিনয় উপাদানের বিচিত্র প্রয়োগ এবং নানাবিধ উপস্থাপনার মধ্যেই বাংলাদেশের লোকনাট্যের বিভিন্ন পরিবেশনারীতিকে সুনির্দিষ্ট করে চেনা যায়। মূলত অভিনয় উপাদানের প্রয়োগ–বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কারণে এবং পরিবেশনায় আঙ্গিকগত ভিন্নতার জন্য লোকনাট্য পরিবেশনারীতিতেও লক্ষ্য করা যায় বৈচিত্র্যের সমাহার। অর্থাৎ অভিনয় উপাদানের এক বা একাধিক উপাদানের একক বা সমষ্টিগত প্রয়োগের কারণে লোকনাট্য পরিবেশনায় এক একটি রীতি তার স্ব স্ব আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অভিনয় উপাদানের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশনার আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশের লোকনাট্যকে আট শ্রেণীর অভিনয়রীতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যথা– ক. বর্ণনাত্মক রীতি (যা কথানাট্য নামেও আলোচিত হয়েছে) খ. সংলাপাত্মক রীতি গ. মিশ্ররীতি ঘ. নাটগীতরীতি ঙ. অধিব্যঞ্জনাত্মক বা অধি-ব্যক্তিক রীতি চ. প্রতিযোগিতামূলক ছ. শোভাযাত্রা মূলক এবং জ. কথনরীতি। লোকনাট্যের নৃত্য, গীত ও কথা'র অদ্বৈতরূপ বা স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে 'রীতি'র আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আখ্যানোক্ত বিষয়বস্তুর সহজ সরল উপস্থাপনার নিমিত্তেই প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন অভিনয়–উপাদান। দেখা যায় অভিনয় আয়তনের বহু বিচিত্র ব্যবহার, নির্মাণ করা হয় বর্ণিল আসর বা মঞ্চ আর এসব কিছু মিলেই গড়ে ওঠে অভিনয় বা পরিবেশনারীতি, যা বিষয়বস্তু এবং অঞ্চলভেদে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র।

'বর্ণনাত্মক রীতি'র পরিবেশনা বাংলাদেশের লোকনাট্যের একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধতম ধারা। এই রীতির অভিনয়ে গায়েন একা বা একাধিক কুশীলবের (যন্ত্রী বা দোহার) সহায়তায় গীত, গদ্য ও কাব্যের বর্ণনাত্মক অভিনয়–উপাদানের একক বা সমষ্টিগত প্রয়োগে একটি আখ্যান উপস্থাপন করে থাকেন। এক্ষেত্রে গায়েন কখনো কখনো দোহার বা যন্ত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঘটনা বা চরিত্রের তৃতীয় পুরুষে অভিনয়

না। প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই চর্যাপদ থেকেই পাওয়া যায় বাংলাদেশের লোকনাট্যচর্চার প্রাচীন পর্যায়ের নিদর্শন "বুদ্ধনাটক।" যদি চর্যার সময়কাল নবম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ কিংবা অন্যমতে কমপক্ষে সপ্তম শতক থেকে এর সূচনা মেনে নেয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের লোকনাট্যচর্চার ইতিহাস এক হাজার থেকে বারশত বছরের পুরনো নয়। বস্তুগত নিদর্শনের সূত্র ধরে লোকনাট্যের ইতিহাসের এক রকম সময়সীমা নির্ধারণ করা গেলেও এ কথা প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের লোকনাট্য–ঐতিহ্যের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস আরো প্রাচীন। মূলত 'প্রাচীন সংস্কৃতির ভিত্তির ওপরই গত এক হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির অবয়ব গড়ে উঠেছে। তার কাঠামো নতুন, কিন্তু তা দাঁড়িয়ে আছে বাংলা-পূর্ব ঐতিহ্যের ওপরে।'[১২] সুতরাং বাংলাদেশের লোকনাট্যের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারা দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ক. সংস্কৃত নাট্য–ঐতিহ্য এবং খ. বাংলার স্থানীয় নাট্য–ঐতিহ্য।

সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্য

প্রাচীন আর্য সংস্কৃত নাট্যকলা সমাজের উচ্চকোটি মানুষের সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতিনিধিত্ব করলেও এই ধারার বিকাশের ক্ষেত্রে লোকস্তরে প্রচলিত ও জনপ্রিয় রীতি–আঙ্গিকের প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। সংস্কৃত নাট্যকলার বিভিন্ন রীতি-প্রকরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও দৃষ্টান্ত থেকে একথা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, প্রাচীন আর্য সংস্কৃত নাটকলার যুগেও প্রাচীন বাংলার স্থানীয় নাট্যকলা ছিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাট্যচর্চার প্রধানতম ক্ষেত্র। খ্রিস্ট জন্মের দু'শত বছর পূর্বে রচিত গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র'-এর রচয়িতা ভরতমুনি চতুর্বিধ 'প্রবৃত্তি'র কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবৃত্তি শব্দের ব্যাখ্যায় ভরতমুনি বলেন 'নানাদেশবেষভাষাচারাবার্তাঃ' হচ্ছে প্রবৃত্তি। অর্থাৎ দেশ-বেশ-ভাষা ও রীতি অনুসারে চার ধরনের প্রবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে-অবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী এবং ওড্র-মাগধী।[১৩] ওড্র-মাগধী প্রবৃত্তি প্রসঙ্গে পূর্বভারতের যে সকল অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হয় 'বঙ্গ'ও তার মধ্যে একটি। এই প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ছিল উত্তেজনাপূর্ণ আবেগদীপ্ত বাচিক অভিনয়। নাট্যশাস্ত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এ বৃত্তি 'বহুনৃত্তগীতবাদ্য' সংযুক্ত ললিত-অঙ্গাভিনয়।[১৪] এখানে নৃত্ত ও নৃত্য শব্দ দুটির ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক রীতির বিচার গুরুত্বপূর্ণ। 'নৃত্য'-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এটি মার্গীয় মুদ্রারীতি অনুসৃত পরিবেশনা। কিন্তু 'নৃত্ত' হচ্ছে সুর ও ছন্দযুক্ত সাধারণ অঙ্গভঙ্গি বা আঙ্গিকাভিনয়। ধারণা করা হয় যে, এই 'নৃত্ত' হচ্ছে সে সময়ের স্থানীয় জানপদকেন্দ্রিক লৌকিক নাট্যাভিনয় যা কখনো নাট্যশাস্ত্র অনুসৃত মুদ্রারীতি অনুসরণ করেনি। এই সূত্র ধরে বলা হয় যে, প্রাচীন বাঙলার গ্রামীণ জনপদে প্রচলিত সকল নাট্যরীতি ছিল নৃত্ত বা লৌকিক নাট্যাভিনয়রীতি অনুসৃত পরিবেশনা।

সংস্কৃত সাহিত্য ও নাট্য ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেকেই, যেমন– বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহত্যদর্পণ), ধনিক (অবলোক), শারদা তনয় (ভাবপ্রকাশণ) প্রমুখ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত দশটি প্রধান নাট্যধারার অতিরিক্ত "উপরূপক" নামক এক ধরনের গৌণ নাট্যরীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই গৌণ নাট্যরীতি তথা "উপরূপক" ধ্রুপদী ঐতিহ্যের মূলধারার বহির্ভূত হলেও জনগণের মাঝে এটি ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর অভিনবভারতী গ্রন্থে উপরূপককে "নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধরনের কিছু নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ যেমন, 'রাসক'–একপ্রকার নৃত্য যেখানে সঙ্গীত ও নৃত্যের আধিক্য লক্ষণীয়। 'ভানি'–একপ্রকার গীতিনৃত্য 'প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে বাংলার যার কিছু অংশ নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। "কথানাট্য" ও "নাটগীত" রীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ–যেখানে রয়েছে নৃত্য ও গীতের প্রধান ভূমিকা।'[১৫] এছাড়াও নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত দশরূপকে একক অভিনেতার পরিবেশনা 'ভান' এবং দুই বা তিন জন অভিনেতা দ্বারা পরিবেশিত-'বীথি' নামে দু'টি রীতির উল্লেখ রয়েছে। এই দুটি রূপকের বিশ্লেষণেও দেখা যায়, এগুলোর যথাক্রমে বাংলার 'কথানাট্য' ও 'নাটগীত' রীতির সাথে অনেকাংশে মিল রয়েছে।

দশম শতকের শেষ দিকে অথবা একাদশ শতকের শুরুর দিকের কোনো এক সময় সাগর নন্দী নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' রচনা করেন। গ্রন্থে তাঁর সময়কালে এ অঞ্চলে প্রচলিত নাট্যচর্চার কিছু বিবরণ ও কিছু তালিকা পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় যে, সেকালে কৃষ্ণকথা

অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বিপরীতক্রমে মুসলিম বিষয়ক পরিবেশনায় আল্লাহ, রাসুল, নবী, মা ফাতেমা প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশনাতে দেখা যায় এই দুয়ের সংমিশ্রণ। যেখানে একই সাথে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের উপাস্য ও অবতারগণকে সমান গুরুত্বে স্মরণ করা হয়। কোনো কোনো পরিবেশনায় বন্দনাংশের মধ্যেও পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো দেব-দেবীর বন্দনা, দেশ-বন্দনা, আসর-বন্দনা, গুরু-বন্দনা প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক বন্দনাগীত উপস্থাপিত হয়। কোনো কোনো পরিবেশনা, যেমন- সং-যাত্রার বন্দনাগীতের শেষে কুশীলবদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বন্দনার এই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট লোকসমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা প্রকাশ পায়। তথাপি এটি আখ্যান পর্বে প্রবেশের ক্ষেত্রে কুশীলব এবং দর্শক উভয়েরই একটি প্রস্তুতির সূচনা করে। বন্দনার ক্রমপরিণতিতে কুশীলবগণ আখ্যান পরিবেশনায় পরিপূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগ পায়। পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় মানসিক ও শারীরিক বাস্তবতায় দর্শকও তাদের নিজস্ব ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক চেতনায় সংযুক্ত হতে হতে সংশ্লিষ্ট পরিবেশনার একাত্ম দর্শকে রূপান্তরিত হয়। খ. আখ্যান পর্ব- এটিই মূলপর্ব। যেখানে গায়েন অন্যান্য কুশীলবগণের সহায়তায় বর্ণনাত্মক, সংলাপাত্মক বা উভয়ের সংমিশ্রণে একটি সম্পূর্ণ আখ্যান উপস্থাপন করে থাকেন। পরিবেশনার সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ সময়সীমায় কখনো কখনো আখ্যান বা পালা বিভিন্ন খণ্ডে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন এক, তিন অথবা পাঁচ দিনের মনসা মঙ্গল পরিবেশনায় সম্পূর্ণ আখ্যানটিই সময়সীমা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত আকারে বিভিন্ন খণ্ডে উপস্থাপিত। আবার পীর বিষয়ক আখ্যান সমূহ সাধারণত প্রতি রাতে একটি করে আখ্যান উপস্থাপিত হয়ে থাকে। গ. সমাপনী ভাষ্য (ভরতবাক্য)- এই পর্বে পরিবেশিত আখ্যান দর্শন-শ্রবণের মাহাত্ম্য কীর্তন, আয়োজক-দর্শক ও সুধীজনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন, আবার কখনো দর্শকদের নিকট কুশীলবদের পরিচয় সংঘটিত হয়। পরিশেষে ব্যক্তি, সমাজ ও সকলের মঙ্গল কামনা করে সমাপনী ভাষ্য প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের এই সকল লোকনাট্যচর্চা যুগযুগ ধরে নানা পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে বর্তমান অবধি বিচিত্র ধারায় বহমান। এই সকল রীতির আদি উৎসস্থল কী ছিল সেটা নিশ্চিত করে বলা বা কোনো একটি উৎস থেকেই এর সূচনা হয়েছে, এরূপ সরল মন্তব্য করা অবিমৃশ্যকারিতার নামান্তর। এক্ষেত্রে বাংলা অঞ্চলে মহাকালের বাঁকে বাঁকে প্রবহমান নাট্যচর্চার যে বৈচিত্রময় সূত্রগুলো আজো বর্তমান তার প্রাচীনতম ধারা, বিকাশ ও বিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

বাংলা নাট্যকলার ইতিহাস নানাবিধ আবিস্কার ও তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে ঠিকই, তথাপিও এইসকল তথ্য-উপাত্তের বস্তুগত অপ্রতুলতার জন্যই প্রাচীন যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা আজও অনুসন্ধান অধীন রয়েছে। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলার জানপদকেন্দ্রিক নাট্য-ঐতিহ্যের সবটাই ছিল মৌখিক রীতি অনুসৃত পরিবেশনা। ফলে স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত যা কিছু অন্যান্য সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে স্থান পেয়েছে বা স্থানীয় নাট্যকলার যে সকল আঙ্গিক যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের কারণে অন্যান্য নাট্যসাহিত্যে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে, সেগুলোই কেবল বাংলার নাট্য-ঐতিহ্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও নাট্যচর্চার উৎস, বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসের প্রাচীনতম স্রোতধারায় রয়েছে ধর্ম, ধর্মভিত্তিক নানা উৎসব এবং কৃষিভিত্তিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠান। বাংলা নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশের প্রাচীনতম ধারায় কোন কোন ধরনের ধর্মীয় উৎসব-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এবং লোকস্তরে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক চর্চার রূপ কী ছিল তার কোনো সংরক্ষিত নির্দশন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফলে বাংলায় আর্য সংস্কৃতির আগমন, বিকাশ ও পরবর্তী সময়ে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের জন্য তৈরি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বিশেষত সংস্কৃত নাট্যকলার, যে সকল নিদর্শন রয়েছে, তা থেকেই মূলত প্রাচীন বাংলার নাট্যচর্চার প্রাথমিক সূত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস ও উৎস অন্বেষণে 'ভাষা' ভিত্তিক বাঙালি সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা হলে, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্ব (নবম থেকে বারশত খ্রিস্টাব্দ) 'চর্যাপদ'-এর পূর্বে কোনো উদ্ধৃত নিদর্শনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়

করে। কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক পরিবেশনা– লীলা কীর্তন, মণিপুরী রাসনৃত্য; শিব ও কালী বিষয়ক পরিবেশনা– শিব-গৌরীর নাচ, অষ্টকগান, সন্ন্যাস গান; দেবী মনসা বিষয়ক পরিবেশনা–বেহুলা নাচারী, পদ্মারনাচন, বৌদ্ধ ও নাথ বিষয়ক পরিবেশনা–যোগীর গান, যোগীর পর্ব; ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ক পরিবেশনা–ঘাটুগান প্রভৃতি নাটগীত পরিবেশনা আজো বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়।

'অধি-ব্যক্তিক' রীতি নামে আরেক ধরনের পরিবেশনারীতি রয়েছে, যেখানে কুশীলবের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত 'কথা' বা বর্ণনাত্মক বা সংলাপাত্মক অভিনয় গৌণ হয়ে কুশীলবের ব্যবহৃত দ্রব্য–সামগ্রীই আখ্যান পরিবেশনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পট, পুতুল, মুখোশ প্রভৃতি 'মাইমেটিক'[১১] বা মূকাভিনয়মূলক অভিনয়–উপাদান ব্যবহার করে কুশীলবগণ এই রীতির পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। দোহার বা যন্ত্রী দ্বারা আখ্যানের বর্ণনাত্মক গীত বা কাব্যাভিনয়ের সময় কুশীলবগণ সাধারণত শরীরছন্দ বা নৃত্যের মাধ্যমে বা মূকাভিনয়মূলক উপাদান ব্যবহার করে আখ্যান পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। রামচন্দ্র বিষয়ক পরিবেশনা–মাহেষাখেলা; শিব ও কালী বিষয়ক পরিবেশনা–মুখানাচ, কালীকাচ; মুসলিম বীর ও পীর-দরবেশ বিষয়ক পরিবেশনা–পটুয়াগান (গাজীর পট); ধর্ম নিরপেক্ষ পরিবেশনা–পুতুল নাচ, পটুয়াগান প্রভৃতি পরিবেশনায় এই সকল উপাদানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

'শোভাযাত্রা' মূলক পরিবেশনারীতি হচ্ছে বাংলাদেশের লোকনাট্যের একটি সচল বা চলমান বা ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনা। ধর্ম বা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা কোনো তীর্থস্থানে গমনের জন্য এক স্থান হতে আরেক স্থানে গমনকালীন পরিবেশনা হচ্ছে এই শোভাযাত্রামূলক লোকনাট্য। এই ধরনের পরিবেশনায় জোরালো আওয়াজবহুল সংগীত ও নৃত্য এবং কখনো কখনো মূকাভিনয়মূলক উপাদানের ব্যবহার লক্ষণীয়। কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক পরিবেশনা–জন্মাষ্টমীর মিছিল, নৌকাবিলাস মিছিল; শিব ও কালী বিষয়ক পরিবেশনা–নীলের গাজন; মনসা বিষয়ক পরিবেশনা–মনসা ভাসান যাত্রা; মুসলিম বীর ও পীর-দরবেশ বিষয়ক পরিবেশনা– মহররমের মিছিল, মাদারিয়া মিছিল, বেড়া ভাসান প্রভৃতি।

আঙ্গিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লোকনাট্যের ধারায় আরেকটি জনপ্রিয় পরিবেশনা হচ্ছে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক' রীতি। এই ধরনের পরিবেশনায় সুনির্দিষ্ট কোনো আখ্যানের পরিবর্তে রয়েছে কোনো একটি বিষয়ের দ্বন্দ্বমূলক উপস্থাপনা। এই রীতির পরিবেশনায় দুইজন গায়েন তাদের স্ব-স্ব দোহার দল নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়, যেমন– নারী-পুরুষ, আদম-হাওয়া, নতুন-পুরান, নবী-রসুল প্রভৃতি বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থান নিয়ে বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য ও কাব্যের তালে লড়াই করেন। কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক পরিবেশনা– কবিয়াল পাল্টাগান; শিব ও কালী বিষয়ক পরিবেশনা– অষ্টকগান (চাপান গান); মনসা বিষয়ক পরিবেশনা– ভাসান পালাগান, ঝাঁপান খেলা; মুসলিম বীর ও পীর-দরবেশ বিষয়ক পরিবেশনা– পাইল্যা যাত্রা, সওয়াল জবাব, বিচার গান, নাইচের জারী; ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ক পরিবেশনা– ঘাটু গান, এছাড়াও রয়েছে– কবিগান, কড়চা, লাঠিখেলা, ধুয়া গান।

এছাড়া ছন্দযুক্ত আবৃত্তি বা পাঠমূলক আরো এক ধরনের পরিবেশনা যা 'কথন' রীতি নামে পরিচিত। একজন মাত্র গায়েন বা কুশীলব দোহার বা যন্ত্রীর সাহায্য ছাড়া এবং কুশীলব নিজেও কোনো প্রকার অঙ্গভঙ্গি বা আঙ্গিকাভিনয় ব্যতিরেকে আসরে বসা অবস্থায় কাব্যিক সুর ও ছন্দের সমন্বয়ে একটি আখ্যান পরিবেশন করেন। কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক পরিবেশনা–সুখ কীর্তন; মনসা বিষয়ক পরিবেশনা– মনসার পাঁচালি; বৌদ্ধ ও নাথ বিষয়ক পরিবেশনা– গোরক্ষনাথের পাঁচালি, গোরাক্ষের গান; মুসলিম বীর ও পীর-দরবেশ বিষয়ক পরিবেশনা– পুঁথি পাঠ, জারি, গজল; ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ক পরিবেশনা– কেচ্ছা গান; এছাড়াও রয়েছে পাঁচালি ও ত্রিনাথের গান।

লোকনাট্যের উপস্থাপন কাঠামোতে তিনটি সুস্পষ্ট পর্ব বা পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। যথা– ক. আখ্যান-পূর্ব পর্ব– এই পর্বে কুশীলবগণ নানাবিধ কৃত্যানুষ্ঠান, সমন্বিত যন্ত্রসংগীত বা কনসার্ট এবং বন্দনা পরিবেশিত হয়ে থাকে। বন্দনা লোকনাট্যের পরিবেশনায় অপরিহার্য একটি অংশ। সাধারণভাবে বন্দনা হচ্ছে আখ্যানপূর্ব বর্ণনাত্মক গীত– যেখানে দেব-দেবী, আল্লাহ-রাসুল, দেশ, চারদিক, গুরুজন, আয়োজক, সুধীজন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। হিন্দু ধর্ম বিষয়ক পরিবেশনার বন্দনায় হিন্দু দেব-দেবী এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াদির উপস্থাপনা

এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষে অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে তিনি পোশাকের পরিবর্তন বা একই পোশাকের বহুবিধ ব্যবহার করেন। আবার এক বা একাধিক দ্রব্য-সামগ্রির নানা রূপে ব্যবহার অথবা গায়েন তার শরীর ও কণ্ঠের পরিবর্তনের মাধ্যমে আখ্যানাংশের চরিত্র এবং ঘটনা উপস্থাপন করে থাকেন। গায়েন কখনো কখনো পায়ে ঘুঙুর এবং হাতে চামর ব্যবহারও করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক পরিবেশনা- লীলা কীর্তন; দেবী মনসা বিষয়ক পরিবেশনা- রয়ানিগান, পদ্মাপুরাণ গান, বিষহরির গান, মনসার পাঁচালি; রামচন্দ্র বিষয়ক পরিবেশনা- রামায়ন গান; শিব ও কালী বিষয়ক পরিবেশনা- গোমীরানাচ; মুসলিম বীর ও পীর-দরবেশ বিষয়ক পরিবেশনা- জারিগান, নাইচের জারি, বাংলা জারি, গাজীরগান, খোয়াজ খিজিরের গান, মামাই চম্পার কিচ্ছাকাহিনী; বৌদ্ধ ও নাথ ধর্ম বিষয়ক পরিবেশনা- বৌদ্ধসংকীর্তন; ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ক আখ্যান কিচ্ছাকহিনী, টারিগান, হাস্তরগান- এর কথা উল্লেখ করা যায়।

বর্ণনাত্মক রীতির বিপরীতে রয়েছে 'সংলাপাত্মক রীতি'র পরিবেশনা। এই ধরনের অভিনয়ে গায়েনসহ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে গায়েনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না) একাধিক অভিনেতা তিনটি অভিনয় উপাদান যথা- সংলাপাত্মক গীত, গদ্য ও কাব্যে'র ব্যাবহারের পাশাপাশি পোশাক ও দ্রব্যসামগ্রির চরিত্রানুগ ব্যবহার করে অভিনয় করেন। এই ধরনের পরিবেশনায় গায়েন এবং দোহার বা যন্ত্রীর বর্ণনাত্মক অংশগ্রহণ গৌণ। বরং চরিত্রানুগ সংলাপাত্মক অভিনয়ই এই ধরনের পরিবেশনার মুখ্য উপস্থাপনরীতি। তবে আখ্যানের কোনো অংশ বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষত গীত অংশে বর্ণনাত্মক অভিনয় করতে দেখা যায়। সংলাপাত্মক রীতির পরিবেশনায় কুশীলবের প্রবেশ-প্রস্থানরীতি অনুসরণ করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে (যাত্রা পরিবেশনায় বিশেষ ভাবে তৈরী গ্রীনরুম ব্যতীত) অভিনয় স্থানের পার্শ্ববর্তী কোনো ঘরের বারান্দা বা অস্থায়ী ভাবে নির্মাণ করা গ্রীনরুম থেকে প্রবেশ-প্রস্থান মূলক অভিনয় করা হয়।

কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিষয়ক পরিবেশনা-কৃষ্ণযাত্রা, সাজকীর্তন; রামায়ন বিষয়ক পরিবেশনা-রামযাত্রা; দেবী মনসা বিষয়ক পরিবেশনা-ভাসানযাত্রা; মুসলিম বীর ও পীর-দরবেশ বিষয়ক পরিবেশনা-গাজীর যাত্রা, সত্যপীরের যাত্রা, ইমাম যাত্রা, মানিকপীরের যাত্রা; ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয়ক পরিবেশনা-ঝুমুর যাত্রা, মাইট্টাতামশা, রঙ পাঁচালি, শাস্ত্রীয় পাঁচালি, মাটিয়াল গান, গম্ভীরাগান, সঙ যাত্রা প্রভৃতি রীতির পরিবেশনায় সংলাপাত্মক অভিনয় উপাদানের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

আবার বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয়-উপাদানের সংমিশ্রণে পরিবেশিত এক ধরনের পরিবেশনারীতি লক্ষ্য করা যায়, যাকে সাধারণত 'মিশ্ররীতি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিবেশনায় বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক উপাদানের যুগপৎ প্রয়োগ প্রায় সমমাত্রায় বর্তমান। অর্থাৎ এই ধরনের পরিবেশনায় গায়েন এবং অন্যান্য কুশীলব বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক উপাদানের দ্বৈতাদ্বৈত প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আখ্যানটি পরিবেশন করে থাকেন। এইরূপ পরিবেশনায় কাহিনীর পূর্বনির্ধারিত অংশ সমূহ একাধিক কুশীলবের সংলাপাত্মক গদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়, আর অন্যান্য অংশ সমূহ গায়েন তাঁর সহযোগী অভিনেতা, পাইল, দোহার এবং যন্ত্রীদর সহায়তায় বর্ণনাত্মক বা সংলাপাত গীতের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। রামচন্দ্র বিষয়ক পরিবেশনা- কুশানগান, লক্ষ্মীরগান; মনসা বিষয়ক পরিবেশনা- পদ্মাপুরান গান, ভাসানগান; মুসলিম বীর ও পীর-দরবেশ বিষয়ক পরিবেশনা- জং জারি, মাদারপীরের গান, সত্যপীরের গান, মানিকপীরের গান; ধর্মনিরপেক্ষতামূলক পালাগান প্রভৃতি পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের লোকনাট্যে 'নাটগীত রীতি' একটি নৃত্য ও গীতপ্রধান পরিবেশনারীতি। এই পরিবেশনায় একাধিক কুশীলবের অংশগ্রহণে নৃত্যযুক্ত সংলাপাত্মক গীত ও কাব্যের মূখ্য ব্যবহার এবং সংলাপাত্মক গদ্যের গৌণ প্রয়োগ করে চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে আখ্যান উপস্থাপন করা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনো কখনো দোহার-যন্ত্রীদের মাধ্যমে আখ্যানাংশের গীত পরিবেশিত হয়, যার সাথে অন্যান্য কুশীলবগণ কেবল নৃত্যের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করে থাকেন। সংলাপাত্মক অভিনয়-উপাদানের ব্যবহার মুখ্য হলেও, আখ্যানের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় গায়েন কর্তৃক বর্ণনাত্মক অভিনয়-উপাদানের প্রয়োগ ও প্রাত্যহিক গদ্যের ব্যবহার এই রীতির পরিবেশনায় যথেষ্ট গুরুত্ব বহন

ও রামকথা অবলম্বনে নাট্যরচনা বেশ জনপ্রিয় ছিল। এসকল নাট্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও অনুমান করা হয় যে, 'তার কোন কোনটির মধ্যে অবহট্ট অথবা প্রাচীন বাংলা ভাষার গান সন্নিবিষ্ট ছিল।'[১৬] বাংলার রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব বারো শতকের শেষদিকে রচনা করেন 'গীতগোবিন্দ'। বর্তমানে সংরক্ষিত প্রাচীনতম নাটলিপি হিসেবে এটি অন্যতম। গীতগোবিন্দ সম্পর্কে বলা হয় যে, জয়দেব তৎকালীন বাংলায় গ্রামীণ জনপদে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যানের বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা করেন এই নাটলিপি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই নাটলিপি রাধা, কৃষ্ণ ও সখী এই তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্র অভিনয়সহ সঙ্গীত, কাব্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে উপস্থাপিত গীতগোবিন্দকে 'নাটগীত' শ্রেণীভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ বা মনে করেন, 'জয়দেব "জানপদ" ও "অভিজাত" এই দুয়ের মাঝে এক ধরনের সমন্বয় সাধন করেছেন'।[১৭] ত্রি-চরিত্রের নাটগীতরীতির ধারাটি পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাধনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। রাজপৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সংস্কৃত নাট্যচর্চার ধারা ক্রমশ বিলোপ সাধন হলেও, বাংলার লোকনাট্য থেকে এই ধারার বিলোপ সাধন হয়নি, বরং 'নাটগীত' ধাঁচের এক জানপদ নাট্যরীতির মাধ্যমে, বাংলার রাধা ও কৃষ্ণ কাহিনী ভিত্তিক আখ্যান– যথা, ঘাটুগান, ছোকরানাচ, রাসলীলা প্রভৃতি পরিবেশনায় নৃত্য–গীত ও সংলাপের একটি সমন্বিত উপস্থাপনার প্রচলন আজও অস্তিত্বশীল রয়েছে।

প্রাচীন বাংলার জনপদে লোকনাট্যচর্চায় প্রচলিত বিভিন্ন আখ্যানের নাটলিপি বা বস্তুগত নিদর্শন না থাকলেও সংস্কৃত নাট্য–ঐতিহ্যের নানা তথ্য ও নমুনা বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলার নাট্যকলা আর্য সংস্কৃতির নাট্যকলার মূল ধারার পাশাপাশি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাট্যচর্চা স্বতন্ত্র ধারায় স্বকীয়তার সাথে প্রবহমান ছিল। আজ যাকে 'নাটগীত' (একাধিক অভিনেতা/অভিনেত্রীর নৃত্য ও গীত বহুল আঙ্গিকাভিনয়) এবং 'কথানাট্য' বা 'বর্ণনাত্মক রীতি' (একক কুশীলবকৃত কাব্য ও গীত-ছন্দের সমন্বয়ে পরিবেশনা) বলা হচ্ছে, মূলত এর বীজ প্রোথিত ছিল ঐ প্রাচীন বাংলার জানপদকেন্দ্রিক নাট্যকলার মধ্যে।

বাংলার স্থানীয় নাট্য–ঐতিহ্য

বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে ৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ পাল ও সেন শাসনামল যথেষ্ঠ গুরুত্ব বহন করে। এই যুগের কোনো এক সময় লিখিত হয়ে থাকবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'। মূলত এ যুগের আবিষ্কারের 'একমাত্র নিদর্শনও এই চর্যাপদ'।[১৮] বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ দ্বারা রচিত এই চর্যাপদ হচ্ছে কতগুলো কবিতা বা গানের সংকলন। 'বীণা পা (নবম খ্রিস্টাব্দ) রচিত ১৭ সংখ্যক পদে 'বুদ্ধনাটকে'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] "নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥" অর্থাৎ, বজ্রাচার্য নাচেন, দেবীগান করেন। বুদ্ধ নাটক হয় বিষম (শক্ত)। এই পদ থেকে বাংলার আদিযুগের নাট্যরীতি সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায় যে, চর্যাপদে উক্ত 'বুদ্ধনাটক' হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের নাট্যপদ্ধতি। বলা হয়ে থাকে যে, সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ধর্মমত প্রাচারের জন্য এই শিল্পের আঙ্গিক ব্যবহার করতেন যা ছিল নৃত্য, গীত এবং শারীরিক কসরৎ তথা যোগাচারের সমন্বিত উপস্থাপনা। এই ধরনের পরিবেশনায় কুশীলব হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের মিলিত অংশগ্রহণেরও উল্লেখ রয়েছে। চর্যাপদের মাধ্যমে তৎকালীন নৃত্যকলা সম্পর্কেও পাওয়া যায় সুস্পষ্ট ধারণা ১০ সংখ্যক চর্যায় দেখা যায়– "এক সো পদমা চউসটঠী পাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী" অর্থাৎ নৃত্যপটিয়সী ডোম্বীর নৃত্যকলা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ১০ সংখ্যক চর্যাতেই 'নড়পেড়া' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। নড়পেড়া শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'নটপেটিকা'। যদি এ কথা সঠিক হয় তবে সে-কালেও ছোট ছোট পেটিকা বা বাক্স পেটরায় 'নটনটীর সকল সাজ পোষাক' থাকত। এই ব্যাখ্যা সে-সময়ের পেশাজীবীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যারা বুদ্ধনাটক পরিবেশনার্থে সাজ-পোষাক সংরক্ষণ করতো। এছাড়া তিব্বতীয় রেখাচিত্রের অস্তিত্ব থেকে সিদ্ধাচার্যগণকৃত দর্শক সম্মুখে অভিনয়ের সূত্র অনুসন্ধানও আজ স্বীকৃত।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মধ্যযুগ (১২০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এ যুগেই বাংলা নাট্যে বিবর্তনের ধারায় বিকশিত হয় একাধিক সমৃদ্ধতম রীতি ও আঙ্গিকের। যদিও এই যুগের প্রথম পর্যায়

অর্থাৎ ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে বলা হয় 'অন্ধকার যুগ'। কেননা এ সময়ে বাংলার নাট্য--ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেই শুধু নয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোনো শাখাতেই উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো নিদর্শন লাভ করা যায় না। এই সময় অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলের অভ্যুদয় এবং তৎপূর্ববর্তী সেন আমালের ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের ব্যাপকতায় তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় এই সময়কালকে গ্রহণ, বর্জন ও আত্তীকরণের যুগ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এই সময়েই লক্ষ্য করা যাবে যে, বৌদ্ধধর্ম, নাথপন্থী এবং ধর্মঠাকুর মতাবলম্বী বা অনুসারীদের দ্বারা প্রবর্তিত বেশ কিছু পরিবেশনারীতি ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক চর্চায় আত্মীকৃত হয়। পাশাপাশি মুসলিম শাসনের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলার নাট্য–ঐতিহ্যে যুক্ত হয় বেশকিছু রীতি ও আঙ্গিকের। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অস্থিতিশীল সময়ের বাংলা নাট্যচর্চার কোনো নিদর্শন আবিস্কৃত না হলেও ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত প্রধান-অপ্রধান অসংখ্য নাট্যরীতি এবং লিখিত বা নাটলিপি অনুসৃত পরিবেশনার অস্তিত্ব এই কথাই প্রমাণ করে যে, নাটলিপি অনুসৃত আখ্যানের মৌখিক ধারার পরিবেশনা বহু পূর্ব থেকেই স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাসকৃত 'চৈতন্যভাগবত' (১৫৪৫-১৫৫৩-৫৫ খ্রিঃ) থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের জন্মের (১৪৮৬-১৫৩৩) সমসাময়িক সময়ে বাংলা জনপদে মনসার গীত, চণ্ডী বাশুলীর গান, শিবের গানের ব্যাপকতা ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, তখনো যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীত লুপ্ত হয়নি। এমন কি স্থানীয় লোকসমাজে কৃষ্ণলীলার গানও ছিল বেশ জনপ্রিয়, যা সুদীর্ঘ শত বছরের মৌখিক রীতির পরিক্রমায় সাধারণ মানুষের মাঝে বহমান ছিল। তাই একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, মধ্যযুগে আবির্ভূত অসংখ্য প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যলিপির উপস্থিতি স্থানীয় জনগণের মাঝে প্রচলিত মৌখিক রীতির নাট্যচর্চার সুদীর্ঘ অতীতেরই সাক্ষ্য বহন করে। বিবর্তনের স্রোতধারায় বাংলা অঞ্চলের লোকনাট্যের যে উর্বর ভিত্তি–ভূমি রচিত হয়েছে তাকে বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বিচারে নিম্নোক্ত ধারায় আলোচনা করা যায়।

ক. রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা
খ. অনার্য দেব-দেবী বিষয়ক আখ্যানভিত্তিক পরিবেশন
গ. শিব ও কালী বিষয়ক আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা
ঘ. মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বীর ও সাধুগণের কাহিনীভিত্তিক পরিবেশনা
ঙ. প্রেম-প্রণয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা
চ. বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মভিত্তিক পরিবেশনা
ছ. মিশ্র বিষয়ভিত্তিক এবং অধিব্যঞ্জনাত্মক পরিবেশনা

রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা

প্রাচীন বাংলা ছিল বহু বিস্তৃত এবং বিভিন্ন জনপদ কেন্দ্রিক অঞ্চলে বিভক্ত, যা আবার প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক সীমায় যুক্ত ছিল। 'বঙ্গ' সে সকল জনপদের একটি। এই বিস্তৃত ভৌগলিক সীমায় গড়ে ওঠা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা শাখা-প্রশাখা প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে মিলেমিশে একে অপরকে করেছিল সমৃদ্ধ। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে রামায়ণ ও মহাভারত দুটি বিশেষ পৌরাণিক অবদান। বৈদিক ধারার সাহিত্য হলেও অসংখ্য জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং মানবিক চাহিদার খোরাক জোগাতে এবং স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশে এই দুটি কাব্যের জোরালো ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আবার একথাও মনে করার কারণ নেই যে, বাল্মীকিমুনি ও ব্যাসদেব–দুই মহান কবি জীবনের কোনো বাঁকে এসে হঠাৎ করেই নিতান্ত কল্পনা–প্রসূত হয়ে এই দুটি কাব্য রচনা করেছেন। বরং বহু বিক্ষিপ্ত পুরনো কথা আহরণ করে, সংকলন করে, গ্রহণ–বর্জন–সংস্কার করে আপন প্রতিভায় সৃষ্টি করেছেন এই অনুপম কাব্য। এই দুই কবি কোনো ব্যক্তি বিশেষ নন, এরা সমগ্র জাতির সম্মিলিত সৃজনী শক্তির প্রতিনিধি। রামায়ণ সম্পর্কে বলা হয় যে, রামায়ণ সম্পূর্ণত আর্যদের নয়। আর্যদের ভারতবর্ষে প্রবেশের বহু পূর্ব থেকে 'অনার্যজাতি সমূহের মধ্যে' রামায়ণ কাহিনী

প্রচলিত ছিল।[20] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল। ... রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্ব সূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।[21] বাংলার লোকসংস্কৃতি পৌরাণিক সাহিত্য দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছে তেমনি বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রভাব সংস্কৃত মহাকাব্যকে বহুলাংশে করছে লোকগাথায় রূপান্তরিত। তাইতো শ্রীকৃষ্ণের হাতে পাঞ্চজন্যের পরিবর্তে বাঁশি তুলে দিতে কুণ্ঠিত হননি সে যুগের কবিগণ। কৃষ্ণের মহাকাব্যিক চরিত্রকে রূপায়িত করা হয়েছে গল্পসমৃদ্ধ গাথা–কাব্যের প্রণয়পিয়াসী যুবক কৃষ্ণে। 'শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের তুরীয় মহিমা লৌকিক সংস্কৃতির স্পর্শে রাধা–শ্যামে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের আর্য বীরগাথা, রাজবৃত্তের সংগ্রামী ইতিহাস তার লৌকিক রূপায়ণ বা লোকবৃত্তের মধ্যে তার সহজ স্বীকৃতি প্রথম দিকে সহজ সাধ্য হয়নি। বাংলার লোকসমাজে যে লৌকিক কৃষ্ণ বৃন্দাবনী লীলায় মত্ত ছিল, সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাসের প্রতিভার দাক্ষিণ্যে, সেই লৌকিক কৃষ্ণের সার্থক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল লোকসংস্কৃতি ও আর্য-সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে।[22] সুতরাং একথা আর অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, সমাজের 'শিষ্ট' শ্রেণীর রচিত কাব্য আজ পরিবৃত হয়ে আছে লোকসাহিত্য তথা লোকনাট্যের বিভিন্ন শাখা–প্রশাখায়, তার বিরাট পটভূমির অফুরন্ত বৈচিত্র্যময়তায়। গ্রামীণ কবি তাঁর আপন পরিবেশে আপন প্রতিভার গুণে রচনা করেছেন কতশত আখ্যানকাব্য যা কোজাগরী পূর্ণিমায় গ্রামীণ আসরের বা হ্যাজাক বাতির আলোয় কখনো পাঁচালির সুরে, আবার কোনো মন্দিরের চৌ-চালার নিচে নাটগীতের ছন্দে আজো অভিনীত হয় এই সকল আখ্যান।

রামকাহিনী ভিত্তিক নানা আখ্যান চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বাংলায় 'লোকগাথা' আকারে স্থানীয় জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত ছিল।[23] মূলত কৃত্তিবাস ওঝা (জন্ম ১৩৯৯ খ্রি) রচিত 'রামায়ণ'(১৪১৫-১৪৩৩) দিয়ে মধ্যযুগের বাংলায় তথা বাংলা সাহিত্যে পাঁচালি কাব্যের ইতিহাস সূচিত হয় যা 'শ্রীরাম পাঁচালি' নামে গ্রামীণ সাধারণের মাঝে 'কথানাট্য', 'বৈঠকী' রীতিতে পরিবেশিত হতো।

পাঁচালিকে গেয় কাব্যের অর্থেই গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনও পাঁচালিকে গেয় অথবা পাঠ্য আখ্যায়িকা কাব্য বলেছেন। অনুমান করা হয় যে, বাংলার বর্ণনাত্মক অভিনয়ের ধারায় কথানাট্য–রীতি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি 'বৈঠকী' রীতিতে পরিবেশিত হতো। বৃত্তাবদ্ধ দর্শক অবস্থানের মাঝে গায়েন যিনি 'কথক' বা 'কথক ঠাকুর' নামেই অধিক পরিচিত–একটি অনুচ্চ বেদীর ওপর আসন গ্রহণ করে এককভাবে রামকাহিনী পরিবেশন করতেন। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি এবং সুরের মাধুর্যমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বাচনিক প্রয়োগ দ্বারা কথক কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রসমূহ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতেন কোনো দোহার অথবা যন্ত্রীদলের সাহায্য ব্যতিরেকেই। কথকঠাকুর যখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে ভারতকথা বা রামকথার শ্লোক আবৃত্তি করেন, তখন গ্রামের সহৃদয় শ্রোতা ভক্তি–বিনম্র চিত্তে তার জাতীয় মহাকাব্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। মূলত এই কথকতা'র মাধ্যমে বাংলায় রামকথা-ভারতকথা প্রসার লাভ করে। পরবর্তী কালে সম্ভবত আঠারো ও উনিশ শতকে রামায়ণ ও মহাভারত ভিত্তিক এই কথকতা বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়। যেমন– রামায়ণগান, কুশানগান, লক্ষীরগান, পটুয়াগান, রামলীলা, ঝুমুরগান, প্রভৃতি। শুধু তাই নয় রামকথা-ভারতকথা কেবলমাত্র ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেনি বরং অসংখ্য লোককবি আজো এই রাম ও ভারতকথা শুনে আপন প্রতিভার আনুকূল্যে লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেন। আজো বিয়ের রাতে গ্রামের মহিলারা বরের মাকে কেন্দ্র করে গান করেন, 'ওগো রামের মাগো...' ইত্যাদি। পাতা নাচের গান, ঢেঁকি মঙ্গলা ও সারিগানের তালে তালে আজো গীত হয় রামকথা-ভারতকথা। বাংলার গ্রামাঞ্চলের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, গৃহস্থলীর আসরে, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে রামায়ণ ও মহাভারতের পরিবেশনা সামাজিক মিলন–মেলার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

রামায়ণগানঃ রামায়ণ বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনার মধ্যে বর্ণনামূলক 'রামায়ণগান' সবার্ধিক জনপ্রিয় এবং প্রচলিত একটি রীতি। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর জেলাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'রামায়ণগান' পরিবেশনার প্রচলন রয়েছে। ব্যাপক আকারে এই রামায়ণগান রামকীর্তন, রামলীলা,

রামমঙ্গল প্রভৃতি নামে পরিবেশিত হচ্ছে। সাধারণত গ্রামের গৃহস্থ হিন্দু পরিবারগুলো বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যেমন–সন্তান জন্মগ্রহণ বা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অথবা দূর্গা পুজা বা কালী পুজা বা কোনো প্রকার মানসা (মানত) পূরণের লক্ষ্যে রামায়ণগান পরিবেশনের আয়োজন করে থাকে। দর্শক-আসনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের দেখা যায়। তবে এই পরিবেশনার কুশীলবগণ সাধারণত হিন্দু এবং সকলেই পুরুষ। রামায়ণগান বর্ণনাত্মক রীতির পরিবেশনা। গায়েন তার দোহার ও যন্ত্রীদের সহায়তায় বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য ও কাব্যের মাধ্যমে আখ্যানের বর্ণনাত্মক অভিনয় করে থাকেন। গায়েন তার পায়ে ঘুঙুর এবং হাতে চামর ব্যবহার করেন। গায়েন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আখ্যানের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করলেও দোহারদের সহযোগিতায় উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপাত্মক অভিনয় এবং পোশাক ও দ্রব্য–সামগ্রীর ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয় এবং গায়েনের কণ্ঠে রামায়ণের ব্যাখ্যায় সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার যে অপরূপ সাম্যের সুর বেজে ওঠে তাতে রামায়ণগান কেবলই কোনো ধর্মীয় পরিবেশনা থাকে না বরং তা যেন সকল মানুষেরই মানবিক চাহিদার অফুরন্ত ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। কুষ্টিয়ার রামচন্দ্র মোহন্ত গোসাইয়ের কণ্ঠে তাই যেমন মানব মহিমার সুর বেজে ওঠে:

বর্ণনাত্মক গীত: বুলবুলি তাই যুগল হইয়া করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব।
চলো যাইবো মোরা দুজনা মদিনা নগরে।
ও মাতা আমিনার কোলেতে প্রকাশ পেয়েছেন মহানবীজীর চাঁদ॥

বর্ণনাত্মক গদ্য: আমিনার কোলেতে বিশ্বনবীজী আসলেন। যে মেয়ে আমানত ধনকে খেয়ানত করেন নাই। তার কোলেতে আজকে বিশ্বনবী আসতে বাধ্য হলেন।

আমাদের সনাতন শাস্ত্রে মা কৌশল্যার কোলে রামচন্দ্র আসলেন–রামচন্দ্র, নিতাইচাঁদ, গৌরচাঁদ, নবীজীর নামও চাঁদ। তাই আজ কৌশল্যা–যে মেয়ে কৌশলব্রত পালন করেছে, তাঁর কোলেতে সুপুত্র আসতে বাধ্য হলেন। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে আঠারো মুকামের মধ্যে আগে সর্বপ্রথম রাধা-গোবিন্দ, রাম-সীতা প্রভুতত্ত্ব কারা স্বামী-স্ত্রীতে বুঝতে পারলেন?

বর্ণনাত্মক গীত: ভোমর ও ভোমরী যুগল হইয়া করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব।
চলো যাইবো মোরা দুজনা অযোধ্যা নগরে।
ও মাতা কৌশল্যার কোলেতে প্রকাশ পেয়েছেন ওই না রামচাঁদ।[২৪]

গায়েনের সংগীত, নৃত্য আর কথার শৈল্পিক প্রকাশে রামায়ণ গান তাই আর ধর্মীয় গান নয়, এ যেন ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবতার গান হয়ে ওঠে।

কুশানগান: কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট তথা বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে মহাকাব্য রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ড অবলম্বনে পরিবেশিত হয় 'কুশানগান'। সাধারণত হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসব এবং পার্বণ যেমন, দুর্গা, লক্ষী, সরস্বতী, জগধাত্রী, কালী প্রভৃতি পুজা উপলক্ষে; আবার কখনো ফসল কাটার মৌসুমে বা ব্যক্তিগত মানসা পূরণের লক্ষ্যে কুশাণ গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। কুশান গানের কুশীলবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও পরিবেশনার দর্শক-আসনে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। কুশীলবগণ সকলেই পুরুষ, তবে কোনো কোনো কুশান দলে সীতার চরিত্রে অথবা ছুকরির (পুরুষ কর্তৃক নারীর সাজে নৃত্য ও গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ) অভিনয়ে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ১২ থেকে ১৫ ফুট বর্গাকার একটি অভিনয়–আয়তনের কেন্দ্রে সকল কুশীলব বৃত্তাকারে অবস্থান করেন যেখানে বর্গাকার আয়তনের বাইরে চারদিকে দর্শক আসন গ্রহণ করেন। কুশীলবগণ এই বৃত্তকে আবর্তন করে সমস্ত আখ্যানটি পরিবেশন করেন। তবে আখ্যানের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অভিনয়ে আসরের নিকটস্থ কোনো একটি বাড়ির কক্ষকে আসরে প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য সাজঘর হিসেবেও ব্যবহার করতে দেখা যায়। দলের গায়েনকে সাধারণত 'কুশানী' বা 'মূল' এবং সহযোগী অভিনেতাকে 'দোহারী' নামে অভিহিত করা হয়। কুশানী তার হাতে সর্বক্ষণ একটি ব্যানা (একতারের বাদ্যযন্ত্র যা বেহালার মতো করে ব্যবহার করা হয়) ব্যবহার করেন। কুশানী আখ্যানের মুখ্য চরিত্র এবং প্রধান প্রধান অংশসমূহ বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক

কীর্তন: মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার ও প্রচারের বাহন হিসেবে আরও একটি পরিবেশনা 'কথানাট্য' বা বর্ণনাত্মক রীতির অন্তর্গত "কীর্তন" বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শুরুতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রসংশাসূচক নাম-যুক্ত বিভিন্ন রাগ-রাগিনী, তাল-লয় ও ছন্দের সমন্বিত পরিবেশনা যা, 'নামকীর্তন' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে নামকীর্তন কথানাট্য ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত হলে পালাবন্দী কীর্তন গানের প্রচলন ঘটে। এক্ষেত্রে কীর্তনীয়া দোহার ও যন্ত্রী সহযোগে বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য এবং নৃত্যের তালে উপস্থাপন করেন কৃষ্ণ বিষয়ক খণ্ড, খণ্ড পদ বা আখ্যান। যমুনাকেলী, নৌখেলা, বংশী চুরি, বস্ত্রচুরি, দ্যুতক্রিয়া প্রভৃতি রাধা-কৃষ্ণের লীলা যা আজও বাংলাদেশে 'লীলাকীর্তন' নামে জনপ্রিয়তার সাথে প্রচলিত।

এছাড়াও 'পদাবলী কীর্তন' নামে এক ধরনের বর্ণনাত্মক পরিবেশনার প্রচলন ঘটে যা রাধা-কৃষ্ণ লীলার বিভিন্ন বিষয়কে প্রদর্শন করে। পদাবলী কীর্তনে কখনো কখনো নৃত্য ও গীত মূলক বর্ণনাত্মক অভিনয়ের সাথে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ পরিবেশন করতেও দেখা যায়। 'ঢপ কীর্তন' নামে আরও এক ধরনের পরিবেশনা আবির্ভূত হয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে। প্রাথমিক পর্যায়ের ঢপ কীর্তন শুধুমাত্র কীর্তনীয়া এবং এক বা দুজন করতাল বা খোল বাদ্যযন্ত্রীর সাহায্যে সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য বর্জন করে পরিবেশিত হতো বলে জানা যায়। পরবর্তীতে ঢপ কীর্তনে অল্প বয়সী ছেলেদের দ্বারা রাধা ও ছুকরির ভূমিকায় অংশগ্রহণ অন্তর্ভূক্ত হয়। তবে বৈষ্ণব নারী কীর্তনীয়ার অংশগ্রহণে পরিবেশিত চটুল মেজাজের এই কীর্তন পরবর্তীকালে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়।

ঘাটু: বর্তমানে লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ বিষয়ক নাটগীত রীতির এই পরিবেশনার নাম ঘাটু হওয়ার কারণ হলো, ঘাটু পরিবেশনাকারী দল নৌকায় ভ্রমণ করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গমন করে এবং ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে নৌকার পাটাতনের এক পাশে দোহার দল এবং অন্য পাশে অভিনেতারা ঘাটু প্রদর্শন করে, এসময়ে দর্শক নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে এই ঘাটুগান। ঘাটু দলে একজন 'সরকার' বা গায়েনসহ বাদ্যযন্ত্রী ও চারজন নাচিয়ে বা ছুকরি অংশগ্রহণ করে। ছুকরিরা সাধারণত বারো থেকে ষোল বছর বয়সী হয়ে থাকে। এরা সকলেই ছেলে কিন্তু অভিনয়ে মেয়ের সাজ অর্থাৎ শাড়ি ও লম্বা চুল ব্যবহার করে থাকে। দোহারগণের পরিবেশিত বর্ণনামূলক কাহিনী তারা অভিনয় করে থাকে। নৃত্যযুক্ত এই অভিনয়ে কোনো ধ্রুপদী রীতি অনুসরণ না করলেও তাদের সুক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত অভিনয়ের দ্বারা দর্শক মনে প্রেম-বিরহ-বেদনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। ঘাটু গানের বিষয়বস্তু হিসেবে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী প্রাধান্য পেলেও মূলত এর বিশেষত্ব হচ্ছে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত লৌকিক প্রেম ও আদিরসাত্মক উপস্থাপনা। ছুকরিগণের মাঝে একজন রাধা এবং কৃষ্ণ সেজে অভিনয় করে থাকেন। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ময়মনসিংহ ও সিলেটের অংশবিশেষে এই ধরনের পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়। ঘাটু গান শুরুতে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে 'রাধাকৃষ্ণ' উপাখ্যান পরিবেশন করলেও বিশ শতকে এসে ঘাটু গান বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল ত্যাগ করে মূলত গ্রমীণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

অনার্য দেব-দেবী বিষয়ক আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা

বাংলাদেশের লোকনাট্য চর্চায় রাম ও কৃষ্ণের পাশাপাশি অনার্য দেব-দেবী বিষয়ক বেশ কিছু পরিবেশনা রয়েছে যা একাধারে জনপ্রিয় এবং একই সাথে সমাজ জীবনে সাধারণের মানবিক চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বর্ণনাত্মক বা কথানাট্যের ধারায় বিকশিত এই সকল অনার্য দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের স্তুতিমূলক আখ্যান সমূহ 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। বাংলার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রতিষ্ঠিত এই সকল দেব-দেবী, যেমন-মনসা, চণ্ডী, শীতলা, অনার্য দেবতা ধর্ম, সূর্য ও শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রতি রয়েছে মধ্য ও বর্তমান যুগের সাধারণ মানুষের আনুগত্য ও ভক্তি। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত লোকনাট্য পরিবেশনায়, যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তা-ই 'মঙ্গলকাব্য' নামে সারা বাংলায় বিস্তার লাভ করে। মূলত শাক্ত দেব-দেবীর মাহাত্মসূচক কাহিনী বা তাদের প্রতি ভক্তি বা প্রশংসাজ্ঞাপক আখ্যান রচিত হয়েছে এই সকল মঙ্গলকাব্যে। বাংলার পল্লী অঞ্চলে এর উদ্ভব

ভাগবতে' (১৫৪৮) উল্লেখ রয়েছে যে, চৈতন্যদেব স্বয়ং রুক্মিণী চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে তার ভক্তিমূলক প্রেমানুভূতি দ্বারা এমন ভাবে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন যে, অভিনয় বন্ধ রেখে কোলের ওপর কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। অধিকাংশ পণ্ডিতগণই স্বীকার করেছেন যে, এই নাট্যানুষ্ঠানটি ছিল একটি নাটগীত রীতির পরিবেশনা। কেউ কেউ আবার এই অভিনয়রীতিকে 'লীলানাট্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়, সমগ্র শৈব-বিষ্ণু-কৃষ্ণপুরাণের মধ্য দিয়ে গীতায় সংস্থিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে, সন্ন্যাসব্রত কালে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর, তিনি যে, প্রেমধর্ম প্রচার করলেন, তার আদি ছাঁচ যেন বক্ষ্যমাণ নাট্যে লভ্য। যে অলোক-আবেশে যৌবনের প্রারম্ভে আলোড়িত হয়েছিলেন তিনি–নানা পুরাণের একটি অভিন্ন ঐক্য আবিষ্কারের প্রেরণায়, তাঁর আরাধ্য কৃষ্ণের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠায় যে দার্শনিক চিন্তা তখন উদ্ভূত হয়েছিল, তারই শিল্পরূপ হল আলাচ্য লীলানাট্য।'[২৭]

মধ্যযুগের বাংলায় লীলানাট্যের ধারায় নাটগীত পরিবেশনারীতির যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় তার মূল কারণ হিসেবে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন মঙ্গলকাব্যভিত্তিক কথানাট্যে উপস্থাপিত বৃহত্তর সমাজ জীবনের অভিব্যক্তির বিপরীতে কৃষ্ণকাহিনী ভিত্তিক নাটগীতে ব্যক্তিমানসের কামনা, বাসনাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিল।'[২৮] নাটগীত রীতির ধারায় আরো বেশ কিছু পরিবেশনা পালাকীর্তন, লীলাকীর্তন, রাস লীলা প্রভৃতি নাট্যের ব্যাপক ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশনা আজো বাংলার বিভিন্ন পার্বণ, উৎসব আর মন্দির প্রাঙ্গনে লক্ষ্য করা যায়।

যাত্রা: বলা হয়ে থাকে যে, নাটগীত রীতির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও বিকাশের ধারায় এই রীতির সম্প্রসারিত রূপই 'কৃষ্ণযাত্রা'র জন্ম দিয়েছে। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত দেবতা এবং অবতারগণের লীলা ও চরিত্র উপস্থাপনা করাই ছিল এই রীতির অভিনয়ের উদ্দেশ্য। ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মানুসারিগণ দেবচরিত্র কৃষ্ণের অলৌকিক ঘটনা স্মরণ ও চর্চার নিমিত্তে এক প্রকার উৎসব–অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। নাটগীত রীতিতে এই সকল লীলোৎসব-প্রসঙ্গে যে অভিনয় প্রদর্শিত হয় তা-ই পরবর্তীকালে যাত্রা নামে অভিহিত। বর্তমান সময়ের বাংলাদেশের লোকনাট্যে 'যাত্রা' নামে যে নাট্যরীতির সাথে দর্শকের পরিচয় ঘটে 'কৃষ্ণযাত্রা' তারই পূর্বসূরি। কৃষ্ণযাত্রায় কুশীলবগণ সংলাপ, নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি সহযোগে অভিনয় করতেন। নৃত্য ও গীতাংশে সহযোগিতা করতেন একজন অধিকারী কর্তৃক পরিচালিত বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ। অধিকারী প্রয়োজনে কাহিনীর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতেন। কৃষ্ণযাত্রায় তাৎক্ষণিক রচিত গদ্যসংলাপের ব্যবহার, পুরুষ অভিনেতা কর্তৃক চরিত্রাভিনয়, অঙ্গসজ্জা ও পোশাকের ব্যবহার, দর্শক পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত আসরে কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনীর প্রদর্শনী, মূলত বাংলা লোকনাট্যে যাত্রা'র বিকাশে সহায়তা করে।

শুরুতে যাত্রানুষ্ঠানের প্রদর্শনী ভূমি সমতলে মন্দির প্রাঙ্গণ, উৎসব ময়দান এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের বাড়ির উঠান প্রভৃতি স্থানে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আঠারো শতকে এই শিল্প ক্রমাগত জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে, ফলস্বরূপ প্রদর্শনীর স্থানেরও পরিবর্তন হলো। যাত্রা প্রদর্শনী তাই গৃহাঙ্গণ বা মন্দির ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে অস্থায়ী উন্মুক্ত মঞ্চে উপস্থাপিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেল। যাত্রা প্রদর্শনী সাধারণত ১৮ × ১৮ অথবা ১৮ × ১৫ আয়তনের চতুর্দিক উন্মুক্ত আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ২ থেকে ৩ ফুট উচ্চতায় নির্মিত এই মঞ্চের চার কোণে চারটি খুটির ওপর সামিয়ানা বা ত্রিপল অথবা টিন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এক্ষেত্রে কখনো কখনো দর্শক আসনও প্যান্ডেল আকারে সামিয়ানা বা ত্রিপল দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। যন্ত্রীগণ মঞ্চের দুই বিপরীত পার্শ্বের ভূমি সমতলে মুখোমুখি ভাবে অবস্থান করেন। এজন্য তাদেরকে ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট উচ্চতায় মঞ্চের সাথে সংযুক্ত একটি আসন তৈরি করে দেওয়া হয়। যন্ত্রীদলের এই আসনের সুবিধাজনক কোনো একটি স্থানে 'প্রম্পটার' আসন গ্রহণ করে যাত্রা পালার সম্পূর্ণ আখ্যানটি অভিনেতাদের সহায়তায় প্রম্পট বা পাঠ করে থাকেন। মঞ্চের তৃতীয় একটি পাশ থেকে আনুমানিক ২০ থেকে ৩০ ফুট দূরে অবস্থিত সাজঘরের সাথে যুক্ত করে নির্মাণ করা হয় একটি বা দুটি ঢালপথ। এই পথ দিয়েই কুশীলবগণ মঞ্চে প্রবেশ বা প্রস্থান করেন। উন্মুক্ত মঞ্চে সাধারণত একটি চেয়ার বা উচু আসন থাকে, যা নাটলিপির নির্ধারিত স্থান অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। এছাড়া উন্মুক্ত মঞ্চের পুরোটাই অভিনেতৃগণ তাদের অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যিক স্থান ও কাল মূর্ত করে থাকেন।

কংসরাজ বিনাশের নিমিত্তে কৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে কৃষ্ণের আকাঙ্খা পুরণের অর্থাৎ প্রেমের পূর্ণতার মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতিতে এর সমাপ্তি ঘটে। বর্ণনা, সংলাপ এবং উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদের পারম্পর্যময় ব্যবহার এবং এ সকল পদ ব্যবহারে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার উন্মোচন ও কাহিনীর অগ্রগতিতে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' যেন একটি প্রাণবন্ত আখ্যান হয়ে ওঠে। এর ভাষা-সারল্য, অমার্জিত, চিরচেনা প্রকৃতি ও মাটির সঙ্গে সুদৃঢ় যোগাযোগ, রক্ত-মাংসের মানবিক গুণাবলীতে চরিত্রের উপস্থিতি, আখ্যানের সামগ্রিক বিস্তৃতি ও ঘটনা-বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি বর্ণনা, সংলাপ ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে কাহিনীর উপস্থাপনা প্রভৃতি উপাদান বিচার করে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনকে যথার্থ অর্থেই অভিনয়যোগ্য নাটগীতের পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়ে থাকে। কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরাগে কাহিনীর আরম্ভ এবং সেই বিরাগের অনুরাগে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কাহিনীর শেষ। মান-বিরহ আর রাগ-অনুরাগের ওপর নির্মিত কাহিনীতে যে সকল স্তর দেখানো হয়েছে- নাটকীয়তার দিক দিয়ে সেগুলি খুবই চমকপ্রদ। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড ও ছত্রখণ্ডের মধ্যে কৌতুকপ্রদ বাস্তব ঘটনা, কৌতুহলোদ্দীপক পরিস্থিতি এবং মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া, পদগুলির সূচনান্তে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখে সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায় যে, এগুলি গীতপ্রধান কাব্য। পদগুলি পৃথক কিন্তু সমগ্রতায় অখণ্ড নাট্যকাহিনী হয়ে ওঠেছে। চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সমৃদ্ধ নাটকীয়তার নিদর্শন সমগ্র কাব্য জুড়ে বিস্তৃত। কখনো কখনো রাধা ও কৃষ্ণের দ্বন্দ্বযুক্ত সংলাপ যেন কাব্যময়তাকে ছাপিয়ে নাটকীয় গুণাবলীকেই মুখ্য করে তোলে। বংশীখণ্ড থেকে তেমনি একটি দৃষ্টান্ত:

কৃষ্ণ: না বোল না বোল রাধা হেন দুঠবাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী॥
রাধা: চান্দ সুরুজ মোর আছে দুয়ি সাখী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্নু খাইবি দুঈ আখী॥

চৈতন্যের পূর্ববর্তী শ্রী কৃষ্ণকীর্তনের রাধা-কৃষ্ণ কেউই আধ্যাত্মিক বিগ্রহমাত্র নন। এই কীর্তন কোনো আধ্যত্মিক মহিমা প্রচারে কেবলমাত্র চণ্ডীদাসী গীত নয়। এ কাব্যের সকলেই রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। এরা যেন সেদিনের গ্রামীণ-জীবনের প্রেম আর প্রণয়েরই সাক্ষ্য বহন করে। গ্রাম্য বধূর প্রণয়-প্রবঞ্চিত জীবনের দুর্দশা আর বেদনার কথাই যেন বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর এই কাব্যে চিত্রিত করেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ কেউই এখানে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক বা প্রতীক না।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বিভিন্ন খণ্ডগুলির এই নাটকীয়তা এবং ত্রি-চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ এবং বৃদ্ধা মহিলা বড়াই- এই তিনটি চরিত্রের নৃত্য-গীতধর্মী সংলাপ ও বর্ণনার সমন্বয়ে ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের যে নাটকীয় গঠনকৌশল লক্ষ্য করা যায়, তা মধ্যযুগের নাট্যচর্চার আদর্শ হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মূলত 'মধ্যযুগের পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ চৈতন্য এবং চৈতন্য পরবর্তী পর্যায়ের অভিনয়কলাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট গীতগোবিন্দের এই সাঙ্গীতিক আদর্শটি এবং এর কাঠামো থেকেই বিকাশ লাভ করে বাংলাদেশের লোকনাট্য পরিবেশনায় "নাটগীত" রীতি।'[২৬]

চৈতন্য-পরবর্তী রাধা-কৃষ্ণ: কৃষ্ণ-কাহিনী অনুসৃত নৃত্য ও গীত প্রধান উপস্থাপনা ঐতিহ্যের ধারায় মধ্যযুগের নাট্যকলা বিশেষ করে ষোল শতকের বাংলায় 'নাটগীত' রীতির পরিবেশনা ব্যাপক হারে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়কালে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ এবং বাংলার সমাজ জীবনে ভক্তি ও প্রেমের মিলিত প্রতীক রূপে কৃষ্ণধারণার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এই মতবাদ তাই শাস্ত্রীয় ভক্তিবাদের পরিবর্তে 'রাগানুরাগা' ভক্তিকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে, যা মূলত 'প্রেম সত্য- প্রেম ধর্ম' এরূপ ধর্ম দর্শন দ্বারা আপ্লুত হয়ে সমাজ-সংসারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রী কৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণবীয় সাধনায় জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার প্রেম হয়ে ওঠে। কৃষ্ণসাধনার এইরূপ রাগানুরাগা ভক্তির প্রকাশে 'নাটগীতরীতি'ও যেন হয়ে উঠল রাধা-কৃষ্ণের অদ্বৈত মিলনের বাহন অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বিত প্রকাশ। বৃন্দাবন দাস কৃত 'চৈতন্য

অভিনয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করলেও দোহারীর অভিনয়ে লক্ষ্য করা যায়, হাস্যরস ও ব্যঙ্গ-কৌতুক মিশ্রিত সঙ-রীতির অভিনয়। পনেরো শতকের পূর্বকালে প্রধানত বিভিন্ন মেলা-উৎসবাদিতে সঙ চরিত্রটি কথানাট্য-তুল্য রীতিতে ব্যঙ্গাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিক অনাচার ও পীড়ণের চিত্র তুলে ধরতো। কুশানগানের দোহারীর অভিনয়ে এই সঙ-রীতিরই সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সারা রাত জেগে এই গান পরিবেশিত হয় বলে কোথাও আবার কুশানগানকে 'জাগের গান'ও বলা হয়ে থাকে।

লক্ষীর গান: বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকায় রামায়ণের 'উত্তরাকাণ্ড' অবলম্বনে পরিবেশিত হয় এই লক্ষীর গান। এই পরিবেশনায় সীতাকে দেবী লক্ষ্মীর অবতার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। লক্ষীর গান হিন্দু ধর্মীয় পরিবেশনা হলেও মূলগায়েনের ভূমিকায় মুসলমান কুশীলবের অংগ্রহণ প্রায়সই লক্ষ্য করা যায়, যা এই পরিবেশনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাজশাহীর দূর্গাপুর অঞ্চলের এ রকম একজন গায়েন মো: আজিজুল খান-এর ব্যাখ্যায় সীতাকে মা ফাতিমার এবং রাম কে হযরত আলী-এর সাথে তুল্যমূল্যে সমান মর্যাদায় দেখেন। এই গায়েনের অভিনয়কালীন অনেক হিন্দু দর্শক তাকে গুরু হিসেবেও শ্রদ্ধা করে থাকেন।

সাধারণত ১২ ফুট দীর্ঘ একটি বর্গাকার আয়তনে কুশীলবগণ অভিনয় করে থাকেন, যেখানে দর্শক চারদিকে বসে থাকেন। মূল গায়েনের সাথে ৬ থেকে ৮ জন কুশীলব নৃত্য ও গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। তবে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন দু'জন পাইল, এদেরকে দোহার বলা হয়ে থাকে।

রামায়ণ অবলম্বনে বা প্রভাবজাত পরিবেশনা কেবল হিন্দু ধর্মানুসারিদের মাঝেই সীমবদ্ধ থাকেনি বরং এর প্রভাব মুসলিম কবি এবং পরিবেশনাতেও লক্ষ্য করা যায়। জারিগান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় করুণ বিয়োগান্তক এবং আহাজারিমূলক হলেও এইগান বাংলার রামায়ণকে ধর্মীয় বিবেচনায় দূরে ঠেলে দেয়নি। একটি জারিগানে তাই বলছে–

জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে যাইমরে।
হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন
ওহে যেনা পথে দিছিরে দুই ভাই জোরের ভাই এমাম হোছেন।
সেই না পথে যাবোরে আমি করো আমার গোরকাফন।
রাম লক্ষণ গেছেরে বনে অযুধ্যা ছেড়ে।
ঐরকম গেছেরে দুই ভাই মদিনা শূণ্য করে।[২৫]
(পরবর্তিতে জারিগান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)

বাংলা অঞ্চলে রাম এভাবেই যুগযুগ ধরে ধর্ম আর বর্ণের বাইরে এক সার্বজনীন চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করে, পরিপুষ্ট করেছে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে।

মধ্যযুগে বাংলার স্থানীয় নাট্যকলা বা লোকনাট্যকে প্রবলভাবে আলোড়িত করার ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যান ও পরিবেশনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলার লোকনাট্যকলায় রাধা-কৃষ্ণের সামগ্রিক বিচরণকে চৈতন্য-পূর্ব এবং চৈতন্য-পরবর্তী এই দুটি পর্যায়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

চৈতন্য-পূর্ব রাধা-কৃষ্ণ: বিভিন্ন পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখ থাকলেও বাংলা ভাষায় রচিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রথম এবং সম্পূর্ণত সুনির্দিষ্ট কোনো নাটলিপি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের (১৩৭০-১৪৩৩) 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯১৬ সালে শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক আবিস্কৃত গীতগোবিন্দের আদর্শ অনুসৃত এই পুঁথি পাঠ ও বিশ্লেষণপূর্বক অনেকেই একে 'নাটলিপি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুবৃহৎ এই আখ্যানকাব্য মোট তেরটি খণ্ডে বিভক্ত। জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং বিরহখণ্ড। বলা হয়ে থাকে যে, নাটগীত রীতি– গীতগোবিন্দের ত্রি-চরিত্রের ঐতিহ্য সুদক্ষতার সাথে অনুসৃত হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পরিবেশনায়। এই নাটলিপির অভিনবত্ব এখানেই যে, এগুলি পৃথকভাবে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড কিন্তু সামগ্রিকতায় একটি পরিপূর্ণ আখ্যান, যা

হলেও শেষ পর্যন্ত তা পল্লীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা রাজসভায়ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। 'মঙ্গলকাব্য বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্যসাধনা হলেও, এর সৃষ্টি প্রেরণা কোনো একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস থেকে আসেনি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয় বহন করে।'[২৯]

মঙ্গলকাব্য কেবলমাত্র উন্নত সাহিত্যকর্মই নয় বরং নাটলিপি হিসেবেও এটি সাধারণ ও নিরক্ষর জনগণের ভাব বিনিময়ের সহজ ও সাবলীল মাধ্যম হিসেবে ব্যাপক সমাদৃত। বর্ণনাত্মক রীতির এই পরিবেশনায় একজন কুশীলব মূল ভূমিকা পালন করেন যাকে অঞ্চল বিশেষে মূলগায়েন, গায়েন, গীদাল, কথক প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। মূলগায়েন কাব্য–বর্ণিত আখ্যানটি একাই বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য ও কাব্যের সহায়তায় কখনো নৃত্যযুক্ত আবার কখনো দোহার বা যন্ত্রীদের কারো কারো সাথে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনাত্মক অভিনয় করেন। এ সময়ে দোহার বা যন্ত্রীগণ গীতাংশের ধুয়া এবং বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করে মূলগায়েনকে সহায়তা করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঙ্গলকাব্যের গায়েন হাতে চামর ও পায়ে ঘুঙুর পড়ে থাকেন। এই ধরনের পরিবেশনা খোলা আকাশের নিচে বাড়ির উঠানে, মাঠ বা ময়দান প্রাঙ্গণে মেলাচত্বর বা উপাসনালয়ের নাটমন্দিরে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সাধারণত বৃত্তাকার, বর্গাকার অথবা তিনদিক দর্শক আবেষ্টনে ভূমি সমতলে অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলকাব্য অনুসৃত পরিবেশনা।

মঙ্গলকাব্যের সুদীর্ঘ কাহিনী কতগুলি নির্দিষ্ট পালা আকারে রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী এক একটি আখ্যান বা কাহিনী আট দিনে ষোলটি পৃথক পালায় পরিবেশিত হত। দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আটটি পালা এবং সূর্যাস্তের পর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বাকি আটটি পালা পরিবেশিত হত। কিন্তু এই রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে। ধর্মমঙ্গল বারো দিনে চব্বিশটি পালায় এবং মনসামঙ্গল ত্রিশ দিনে ত্রিশটি পালায় প্রতিটি দিনের বেলায় পরিবেশিত হত। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের শেষ পালার পূর্ববর্তী রাত্রির পালাকে 'জাগরণপালা' বলা হয়। কারণ এই পালাটি সারা রাত জেগে দর্শক উপভোগ করে। পরদিন দিবাপালায় পরিবেশিত হত 'ফলশ্রুতি' অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য শুনলে কি কি পূণ্য হয় তার বিস্তৃত বিবরণ। কখনো কখনো এই পালাকে অষ্টমঙ্গলা বলা হয়। মঙ্গলকাব্যের এই পালা বিভাজন রীতি মধ্যযুগে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা হতো এমন অনুমান করা গেলেও বর্তমানে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এবং বায়নাকারী বা পৃষ্টপোষকের চাহিদা অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক, তিন, পাঁচ অথবা সাত দিনে পালা বিভাজনের ক্রমানুসারে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। বিশেষ কোনো ধর্মীয় উৎসব ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালাসমূহ রাতে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য যেন সমগ্র বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। ক্রমবর্ধমান এবং সর্বব্যাপী বিস্তৃত বৈষ্ণববাদের অগ্রগতিও মঙ্গলকাব্যের এই সর্বত্র প্রতিষ্ঠাকে ব্যহত করতে পারেনি। আখ্যানে তাই সাধারণের সাথে উচ্চবিত্তের অর্থাৎ আর্যের সাথে অনার্যের দ্বন্দ্ব মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এই দ্বন্দ্বই মঙ্গলকাব্যের প্রাণ, যা আখ্যানের নাটকীয়তাকে তীব্র করে তোলে এবং সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং জনসংযুক্তির কারণে কারো কারো মতে মঙ্গলকাব্যভিত্তিক 'কথানাট্য' ছিল মধ্যযুগের বাংলার 'জাতীয় নাট্যকলা'।[৩০] 'এটি ছিল একাধারে জনপ্রিয় ও অর্থপূর্ণ এবং তা শুধু জনগণের আশা-আকাঙ্খাকেই প্রতিফলিত করেনি, বরং মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অনুষ্ঠান হিসেবেও মঙ্গলকাব্য "কথানাট্যে"র গুরুত্ব আমাদের কাছে অত্যধিক।'[৩১]

যেহেতু অনার্য দেবদেবীর মহিমার স্তুতি এবং মঙ্গল কামনার্থে আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছে, তাই যে সকল দেব-দেবীর নামানুসারে মাহাত্মকীর্তন রচিত হয়েছে তার নামানুসারেই কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে। আবার একই দেবতার উদ্দেশ্যে একাধিক কবিও রচনা করেছেন মঙ্গলকাব্য। অনার্য দেবতার স্তুতিসূচক মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল এবং সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের যে ব্যাপকতার চিত্র মধ্যযুগের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, আঠার শতকের পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী সময় থেকে এর প্রভাব ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে তৎকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সাধারণের জীবনে যে সংকট সৃষ্টি করে মঙ্গলকাব্যের আরাধ্য দেবতারা যেন সেই সংকটে নিশ্চুপ, নিক্রিয় হয়েই থাকে। ফলে সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সকল দেবতার নিক্রিয়তায় স্থানীয় জনগণের মাঝে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে।

কিন্তু মঙ্গলকাব্যের এই সর্বব্যাপী পরিবেশনার ক্রমহ্রাসমানতা সত্ত্বেও আজ অবধি বাংলার পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মাঝে অনার্য দেবতাদের এই সকল আখ্যান যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা আর জনপ্রিয়তার সাথে প্রদর্শিত হচ্ছে। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত আখ্যানসমূহ আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে অধিক জনসংযুক্ততার সাথে পূজিত এবং পরিবেশিত হচ্ছে। যেমন– মনসামঙ্গল বিষয়ক পদ্মাপুরাণ গান, পদ্মাবতীর গীত, পদ্মার নাচন, বিষহরির গান, বিষহরির পাঁচালি, কান্দনী বিষহরির গান, ভাসানগান, ভাসান যাত্রা, রয়ানিগান, পদ্মাবতীর পাঁচালি, মনসারগীত, বেইল্যা নাচারী প্রভৃতি। চণ্ডীমঙ্গল বিষয়ক মঙ্গল চণ্ডীর গান, চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতি আজও বাংলায় বিপুলভাবে জনপ্রিয়। বর্তমান বাংলায় মঙ্গলকাব্য বিষয়ক যে সকল আখ্যান প্রচলিত রয়েছে মনসা মঙ্গল তার মধ্যে অন্যতম। পঞ্চদশ শতকের কোনো এক সময় হরিদত্ত নামে এক কবি প্রথম এই বিষয়ক নাটলিপি রচনা করেন বলে গবেষকগণ অভিমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, ষষ্ঠিবর দত্ত, তন্ত্রবিভূতী, বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সহ আরো অনেক প্রসিদ্ধ কবির রচিত নাটলিপির প্রাপ্তি বাংলা অঞ্চলে অনার্যদেবী মনসা বিষয়ক আখ্যানের ব্যাপক প্রভাবের চিত্রই তুলে ধরে। মনসা মঙ্গলের বিভিন্ন কবির আখ্যান নিয়ে সংকলিত– 'বাইশকবি– শ্রী শ্রী মনসা মঙ্গল' নামে একটি গ্রন্থ আজও বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাথে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

রয়ানিঃ বৃহত্তর বরিশাল, বাগেরহাট এবং ফরিদপুর অঞ্চলের কিছু অংশ জুড়ে দেবী মনসার স্তুতিমূলক মনসামঙ্গল অনুসৃত পরিবেশনা 'রয়ানি'র প্রচলন রয়েছে। বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশিত এর আখ্যান রচয়িতা মধ্যযুগীয় কবি বিজয়গুপ্ত। বর্ণনাত্মক রীতির অন্যান্য পরিবেশনা থেকে রয়ানির বিশেষত্ব হচ্ছে এর গায়েন একাধিক এবং প্রত্যেকেই নারী। রয়ানি দলে সাধারণত একজন সরকার এবং দুই থেকে তিনজন গায়েন (নারী শিল্পী) এবং খোল, করতাল, হারমোনিয়াম, বেহালা অথবা বংশী বাদক সহ আরও ছয় থেকে আটজন দোহার অংশগ্রহণ করেন। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে গায়েনদের পশ্চাতে অবস্থান করে হারমোনিয়াম বা বেহালার মাধ্যমে পরিবেশনার সুর, ছন্দ এবং সঙ্গীত নির্ভর আখ্যান নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। রয়ানির গায়েনেরা হাতে চামর ও পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করেন। অঙ্গরচনা হিসেবে মুখমণ্ডলে তিলকের নক্সা অংকন করেন। বর্ণনাত্মক অভিনয়ে দুইজন গায়েন কখনো যৌথ বা কোরাস আকারে আবার কখনো পর্যায়ক্রমে বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করে থাকেন (যেমন-'বন্দনা করিলাম মাগো যন্ত্রে দিয়া ঘা' পয়ারের এই চরণটি যদি একজন গায়েন গেয়ে থাকেন তাহলে বাকি চরণ–'অবধান করো মা জগৎ গৌরীমা' অন্য গায়েন পরিবেশন করেন)। একই সাথে দুইজন গায়েন আসরে উপস্থিত থেকে নৃত্যযুক্ত বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে যখন আখ্যান পরিবেশন করেন, তৃতীয় গায়েন তখন বসে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তবে বর্তমান সময়ে পালার কিছু কিছু অংশ যেমন– রতি দাইয়ে শাক তোলা, ঝালু-মালুর মাছধরা প্রভৃতি তাৎক্ষণিক ভাবে সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। মঞ্চ সাধারণত ১২ ফুট আয়তনের বর্গাকৃতি হয়ে থাকে যার পূর্ব বা উত্তর দিকে মনসার ঘট স্থাপন করা হয়। কুশীলবগণ চারটি খুঁটি দ্বারা নির্মিত নক্সা করা আসরের বাকি তিনদিকে অবস্থান করেন। দর্শক চারদিকে কেবলমাত্র ঘট বা মন্দির যুক্ত অংশটি বাদ দিয়ে আসন গ্রহণ করেন। ভয় ও ভক্তির দেবী হিসেবে মনসার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই রয়ানী গান সাধারণত ভক্তের নানাবিধ মানসা বা মানত পূরণ (রোগ মুক্তি, বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা, গর্ভধারণ প্রভৃতি) এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার পূজা উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

আজও বাংলার গ্রামীণ জীবনে অনার্য দেব–দেবী যেমন–মনসামঙ্গলের পদ্মপুরাণ গান, পদ্মাবতীর গান, পদ্মার নাচন, বিষহরির গান, কান্দনি বিষহরির গান, মনসারগীত, মনসার পাঁচালী, মনসার ভাসান, ভাসানযাত্রা প্রভৃতি চণ্ডীমঙ্গলের মঙ্গলচণ্ডীর গান, চণ্ডীযাত্রা অথবা শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ক আখ্যান ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাথে পরিবেশিত হয়।

শিব ও কালী বিষয়ক আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা

বাংলার ধর্মদর্শনে শিব বিষয়ক আখ্যানের দুটি বিশিষ্ট ও দৃশ্যত একের সঙ্গে অন্যটির বিপরীত ধারা আছে, যা ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, ও শিল্পস্রোতের, ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এর একটি হচ্ছে বৈদিক রুদ্র দেবতা শিব, যিনি ব্রাহ্মণ কর্তৃক রচিত লিঙ্গ, অগ্নি, কূর্ম প্রভৃতি নামে অসংখ্য পুরান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অন্যটি হচ্ছে প্রাগ-বৈদিক বা লৌকিক দেবতা শিব। শিবের এই লোকায়ত রূপ যা শৈব-শাক্ত ধর্ম নামে ব্যাপক পরিচিত। শাক্তধর্ম মূলত তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। বাংলার লোকনাট্যচর্চায় স্থানীয় ভাবে জাত লৌকিক দেবতা নির্ভর কাব্য ও আখ্যানের প্রভাব পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এ পর্যায়ে বাংলার লোকায়ত শৈব-শাক্ত ধর্ম প্রভাবজাত নানাবিধ পরিবেশনারীতির প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে।

শিব কেন্দ্রিক যে সকল উৎসব আজও বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম উৎসবটি হচ্ছে 'শিবের গাজন' উৎসব। মূলত প্রাগৈতিহাসিক লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান ধীরে ধীরে এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল যা গাজন নামে পরিচিত। শৈবধর্ম প্রভাবিত অঞ্চলে এর নাম শিবের গাজন, ধর্মঠাকুর প্রভাবিত অঞ্চলে তা ধর্মের গাজন নামে সুপরিচিত। আবার লৌকিক বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত কোনো কোনো অঞ্চলে আদ্যের গাজন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। শিবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনার্থে এই উৎসবটি প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভিন্ন নামে অথচ একই ধরনের আর একটি উৎসবের কথা জানা যায়, যেটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ এবং বাংলাদেশের রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। 'নীলের গাজন' এবং 'দেল পূজা' পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

গাজন: গাজন বাংলার অতি পরিচিত এবং সর্বব্যাপ্ত একটি উৎসব। সূর্যের গতিকে অনুসরণ করে যতগুলি উৎসব পালিত হয় গাজন তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। শাস্ত্র মতে চৈত্র মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু লোকায়ত বিশ্বাস অনুযায়ী শিব আর গৌরীর বিবাহের মাস এই চৈত্র। দিগন্ত জুড়ে ঢাকের শব্দ আর ভক্তগণ নানান রঙের সাজ পোশাকে পরিক্রমণ করেন গৃহস্থের আঙ্গিনা। এদের সঙ্গে থাকে পুরুষ লিঙ্গের প্রতীক দণ্ড বা দণ্ডী আর মাতৃযোনির প্রতীক পাট বা পাটনী–কাঁধে বা মাথায় শয়ান। সারা দিন উপবাস আর পথচলার ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাদের মুখে–বোম্ বোম্ বাবা মহেশ্বর। পার্থিব তথা দৈহিক ক্লান্তিকে লাঘব করতে চাই আনন্দ। চাই স্ফূর্তি। চাই উৎসব। হর-পার্বতী বা পশুপাখির সাজে বিশিষ্ট রীতিতে নাচ গান করে মেটে সেই উৎসব–তৃষ্ণা।

গাজন উৎসবের সামগ্রিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে 'সন্ন্যাসী ধারা' নামে রয়েছে এক ধরনের কৃত্যানুষ্ঠান। এই কৃত্যানুষ্ঠানে মূল পুরোহিত এবং ভক্তকুল যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক সুখ বিসর্জন দিয়ে কঠিন পরীক্ষার মাধমে শিব ও গৌরীর উদ্দেশ্যে তাদের ভক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। এ পর্যায়ে যে সকল কৃত্য পালন করা হয় সেগুলো হচ্ছে– প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, কাটা ঝাঁপ (নির্দিষ্ট একটি উচ্চতা থেকে ঝাঁপ দেয়া), বানফোঁড় (লোহার কাটা দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ ছিদ্র করা), বটি ঝাঁপ (নির্দিষ্ট একটি উচ্চতা থেকে বটি দা'র ওপর ঝাঁপ দেওয়া), অগ্নি দোলা এবং চড়ক (লোহার বড়শি দ্বারা শরীর ছিদ্র করে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ঝুলিয়ে তারপর শূন্যে পাখার মতো ঘোরানো হয়) প্রভৃতি। এ সব কিছুই করা হয় দেবতা শিব ও পার্বতীর উদ্দেশ্যে নিজেকে বিসর্জনের নিদর্শন স্বরূপ এবং তৎক্ষণিক ভাবে মূল পুরোহিত কর্তৃক তার স্বীকৃতিও লাভ করে থাকে।

কৃত্যমূলক আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি রয়েছে প্রদর্শনামূলক কিছু অনুষ্ঠান, যেখানে ভক্তকুল বিভিন্ন সাজ পোশাকে হর–গৌরী সেজে নৃত্য, গীত এবং বর্ণনার মাধ্যমে শিবের পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশনা করেন। গাজন উপলক্ষে পল্লীর শিবতলা বা মণ্ডপ প্রাঙ্গণ থেকে 'বড় তামসা'র যে শোভাযাত্রা বের হয়, তা গাজুনে শিব নামে একখণ্ড কাষ্ঠ বা পাথরকে বাদ্যভাণ্ড শোভাযাত্রা সহকারে শিবতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই শোভাযাত্রায় নৃত্যগীতসহ শিব সম্পর্কিত নানাবিধ লৌকিক গীত পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যা বেলা মণ্ডপ প্রাঙ্গনে পরিবেশিত হয় 'হনুমান মুখা' বা হনুমানের মুখোশ নৃত্য– ঢাকের তালে একদল কুশীলব হনুমানের মুখোশ বা হনুমান সাজে এই নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। বৃত্তাবদ্ধ এই পরিবেশনায় দর্শকও বৃত্তাকারে অবস্থান গ্রহণ করেন।

মুখোশ নৃত্য গাজন উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ দিক। সাধারণত ভক্তবৃন্দ শুভ-অশুভ, রাম, লক্ষণ, শিব, দূর্গা প্রভৃতি মুখোশ পড়ে ঢাক ও কাসা'র তালে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। লৌকিক বিশ্বাস ও ভাবনা দ্বারা এ উৎসব সক্রিয় ভাবে চালিত হওয়া সত্ত্বেও এর নাট্যগুণ বা লক্ষণকেও সহজে উপলব্ধি করা যায়। গাজনের মূখ্য চরিত্র শিব। তার সঙ্গে লড়াই হয় পিশাচীর। কে এই পিশাচ? একি কোনো তান্ত্রিক পিশাচ চরিত্র?

চৈত্র সংক্রান্তির এই উৎসবে 'বাইদ্যার নাচ' নামে এক বিশিষ্ট পরিবেশনার রয়েছে, যেখানে–তিন থেকে চার জন ছুকরির বৃত্তাবদ্ধ নৃত্যের সাথে, পাশে দণ্ডায়মান গায়েন খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম বাদকসহ গীত পরিবেশন করে থাকেন। হর–গৌরী বা পার্বতীর সাজে এই দল সারাদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই নাচ পরিবেশন করে এবং ফল–মূল, চাল, ডাল সংগ্রহ করে।

কালীকাচঃ বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জ এবং তার পার্শ্ববতী হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে 'কালীকাচ' (কালীর বেশ বা পোষাক ধারণ) পরিবেশনা দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তি বা চৈত্রমাসের শেষ দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে কালীকাচ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সাধারণত গ্রামীণ উঠানের আনুমানিক পয়তাল্লিশ ফুট বৃত্তাকারের চারদিকে দর্শক বেষ্টিত স্থানে এই কাচ পরিবেশিত হয়ে থাকে। দোহার বা যন্ত্রীগণ ঢাক, হারমোনিয়াম, জুড়ি কাসা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহ বৃত্তের একপাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরিবেশনার বেশ কিছু অংশ লিখিত নাটলিপি অনুসরণ করে পরিবেশিত হয়।

পরিবেশনাকালীন সংলাপাত্মক গদ্য এবং কাব্য অভিনয়ের মাধ্যমে এই নাটলিপি উপস্থাপিত হয় এবং পরিবেশনার অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত হয়। পরিবেশনার সকল কুশীলবই পুরুষ এবং এরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। কালীকাচ পরিবেশনাটি ধারাবাহিক ভাবে ছোট ছোট পর্ব বা পালায় বিভক্ত। যেমন–কৃষ্ণ-কালী, দূর্গা-মহিষাসুর, বুড়া-বুড়ি, পেন্টা-পেন্টি, হনুমান নৃত্য এবং বাইদা-বাইদানী প্রভৃতি অংশগুলো নৃত্য–গীত এবং সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

মুখানাচঃ বৃহত্তর রাজশাহীর নাটোর অঞ্চল এবং তার পার্শ্ববতী এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশিত হয় মুখানাচ। বাড়ির উঠানের আয়তাকার অভিনয় স্থানের চারদিকে দর্শক এবং যন্ত্রী বেষ্টিত স্থানে পরিবেশিত হয় এই মুখানাচ। মুখানাচে সাধারণত তিন থেকে চার জন বায়েন যারা ঢাক ও কাসী বাজান এবং আরও তিনজন যারা গীত পরিবেশন করেন এবং খোল, হারমোনিয়াম বাজিয়ে নাচিয়েদের সহযোগিতা করেন। মুখানাচ বিভিন্ন ছোট ছোট পর্বের একটি ধারাবাহিক পরিবেশনা। মূলপর্ব শুরুর আগে দর্শক আকর্ষণ বা কুশীলবদের প্রস্তুতি স্বরূপ 'হাতখেলা' নামে শারীরিক কসরত এবং বাদ্যযন্ত্রের সমন্বিত পরিবেশনা হয়। এরপর শুরু হয় মূলপর্ব অর্থাৎ হনুমান নৃত্য, নরসিংহ নৃত্য, শকুনী নৃত্য, রাক্ষসী নৃত্য, রাম-লক্ষণ-রাবন নৃত্য, বাঘ ও শিকারী নৃত্য, বুড়া-বুড়ি নৃত্য, পাগলের দাঁত মাজন প্রভৃতি খণ্ড একাধিক কুশীলব কর্তৃক সাজ-পোশাক ও মুখোশ পরিধানের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। দল প্রধান বিভিন্ন পর্ব অনুযায়ী বর্ণনাত্মক গীত, সংলাপাত্মক গদ্য বা কাব্য প্রভৃতি অভিনয়–উপাদান কখনো নাটলিপি অনুসৃত আবার কখনো তাৎক্ষণিক ভাবে উপস্থাপন করে থাকেন।

এ ছাড়াও দেবতা শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন স্বরূপ গাজন উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে গোমিরা নাচ (শিব ও কালীর উদ্দেশ্যে পরিবেশিত নৃত্য), কালীর সাজ, দুর্গার সাজ, শিব-গৌরীর নাচ, নীল যাত্রা প্রভৃতি পরিবেশন আজও বাংলার আনাচে কানাচে প্রায় সর্বত্র পরিবেশিত হয়।

গম্ভীরাঃ গম্ভীর (শিব) পুজার উৎসব থেকে গম্ভীরা পরিবেশনার উদ্ভব হয়। চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে নতুন বছর উদযাপন উপলক্ষে এই 'গম্ভীরা উৎসবের রয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছরের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।'[৩২] গম্ভীরা নাট্য অনুষ্ঠিত হয় শিব মন্দির প্রাঙ্গনে এ সময়ে দর্শকবৃন্দ একটি বৃত্তাকার অভিনয় স্থলের চতুর্দিকে আসন গ্রহণ করে থাকে। অভিনেতা এবং দর্শক উভয়ের অবস্থান সমতল ভূমিতে। দেবতা শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে এই নাট্যের আয়োজন করা হয়। অভিনয়স্থলের অনতিদূরে অস্থায়ীভাবে একটি সাজঘরের ব্যবস্থা থাকে। গম্ভীরানাট্য ছয়টি পর্বে বিভক্ত। যথা– ক. ভূমিকা (গানের মাধ্যমে সকল কলাকুশলীকে দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়)

করা হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার কারো মতে শিবের আটটি অতিলৌকিক গুণাবলীর নামানুসারে অষ্টক নামকরণ করা হয়েছে। অষ্টকগানের উপস্থাপিত বিষয় শিব, কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবকে আবর্তিত এবং চৈত্র সংক্রান্তির সারা মাস জুড়েই তা পরিবেশিত হয়ে থাকে। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, 'নীলপুজার গাজন উপলক্ষে এক শ্রেণীর গান শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাকে অষ্টক গান বা অষ্টগান বলে। ইহার সুর, পদবিন্যাস এবং গান গাহিবার ভঙ্গি গাজনের গান হইতে একটু স্বতন্ত্র। নীল বা নীলকণ্ঠ শিবের গাজন হইলেও ইহার গানে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। নিমাই সন্ন্যাসের প্রসঙ্গও ইহাতে বর্ণিত হয়।' সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক এই অনুষ্ঠানে শিব-পার্বতী বা হর-গৌরী অথবা রাধা-কৃষ্ণ, সখীদের চরিত্রাভিনয়ে পৃথক সাজ-পোশাকের ব্যবহার, কুশীলবদের সমন্বিত নৃত্য ও গানের তালে অভিনীত হয় এই অষ্টক গান। নৃত্যাংশে অল্প বয়স্ক কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে, এ সময়ে বয়স্ক পুরুষ কুশীলবগণ গীত পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকের অষ্টক পরিবেশনা সম্পর্কে জানা যায় যেখানে, মূলগায়েন দোহার ও যন্ত্রী সহযোগে গীত পরিবেশন করলে অনধিক চারজন তরুণী এসময়ে নির্বাক অভিনয় ও নৃত্য পরিবেশনে অংশগ্রহণ করে। এই সকল নারী কুশীলবগণ পুরুষ চরিত্রাভিনয়েও সমান ভাবে দক্ষ।

সঙযাত্রা: বাংলাদেশের অদূরবর্তী টাঙ্গাইল অঞ্চলে দেবতা 'দেল ঠাকুর' (শিব)-এর উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শনমূলক এই পরিবেশনারীতির নাম 'সঙযাত্রা'। চৈত্রসংক্রান্তির তিন থেকে পনের দিন পূর্ব থেকে পহেলা বৈশাখ পর্যন্ত সঙযাত্রার প্রদর্শনী চলতে থাকে। গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদের পারিবারিক, সামাজিক জীবনের নানান সঙ্গতি-অসঙ্গতিমূলক ঘটনা বা চরিত্র তথা তাদের পারিপার্শ্বিক ক্ষমতা-কাঠামোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং হাস্য-কৌতুকের ছলে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সঙ একটি কার্যকর মাধ্যম।

বাংলার অতি প্রাচীন নাট্যরীতির একটি সঙ। 'সঙ নামক নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে পরিবেশিত একজাতীয় নাট্যরীতি বাংলায় বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পনেরো শতকের পর কথানাট্যের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় তা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।'[৩৩] মধ্যযুগে সঙ-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, বাংলায় কৌতুক, গান, নাচ ও অভিনয়ের এক বিশিষ্ট রঙ্গব্যঙ্গাত্মক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল।

বর্তমান কালেও সঙযাত্রা গ্রামের খোলা উঠান বা স্কুল প্রাঙ্গনের বৃত্তাকারে বসা চারদিকে দর্শক অবস্থানের মাঝে প্রদর্শিত হতে দেখা যায়। সঙযাত্রার অভিনয়ে প্রবেশ-প্রস্থানরীতি অনুসৃত হয় আর তাই অভিনয় আয়তনের পাশের বাড়ির একটি কক্ষকেই তারা তাদের প্রবেশ-প্রস্থানের অথবা পোশাক পরিবর্তনে গ্রীনরুম হিসেবে ব্যবহার করেন। পুরুষ কুশীলবগণ নারীসহ অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন। সঙযাত্রার মূল পরিবেশনা কাঠামোটি কতগুলি ছোট ছোট ঘটনা দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে সাজানো থাকে। প্রতিটি পর্বের মাঝে নৃত্য ও গীত অথবা রিপোর্ট (খবর পাঠ বা বায়স্কোপে দেখা দৃশ্য যা কখনো একা অথবা দু'জনে পাঠ করেন) পরিবেশনায় দোহার এবং যন্ত্রীগণ গীতাভিনয়ে অথবা পর্বের অভ্যন্তরে নৃত্য-গীত অংশে যন্ত্র বাজিয়ে সহায়তা করেন।

সঙের বিষয়বস্তু, অভিনয়, পোশাক ও রূপসজ্জা সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় চূড়ান্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ছাপ, অন্যদিকে সম্পূর্ণ পরিবেশনাতেই রয়েছে অতিরঞ্জনের নান্দনিক ব্যবহার যা দর্শকের সমাজ ও জীবনের সমালোচনায় আর এক বাস্তবতায় উন্নীত করে।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বীর ও সাধুগণের কাহিনীভিত্তিক পরিবেশনা

বাংলাদেশে লোকনাট্যের বিকাশে বর্ণনাত্মক রীতি বা কথানাট্যের যে বিস্তার মধ্যযুগে লক্ষ্য করা গেছে তার আরো একটি সংগঠিত রূপ দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী মুসলিম বীর ও সাধুগণের কাহিনী ও বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনার মাধ্যমে। মধ্যযুগে মুসলিমদের আগমন এবং ক্ষমতার স্থায়ীকরণ পরবর্তী শিল্প-সাহিত্যে যে ব্যাপক প্রভাব পড়ে তার ফলস্বরূপ মুসলিম বীর, পীর ও দরবেশ এবং ব্যক্তিত্বদের কাহিনী নিয়ে রচিত অসংখ্য বর্ণনাধর্মী আখ্যান যা 'পুঁথি' নামে পরিচিতি পায়। এরকম বেশকিছু পুঁথি যেমন-শেখ ফয়জুল্লার সত্যপীরের পাঁচালি, উজির বাহরাম খানের জঙ্গনামা, সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ, ওফাতে রসুল, শবে মেরাজ ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

গম্ভীরা গান পরিবেশনা

খ. বন্দনা (শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনমূলক পরিবেশনা যেখানে কলাকুশলীগণ তাদের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য শিবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে) গ. ডুয়েট বা দ্বৈতাভিনয় (দুটি চরিত্র শ্লেষ ও বিদ্রুপাত্মক নাট্যাংশে অংশ নেয়) ঘ. চারইয়ারী (চারটি চরিত্র একটি বিদ্রুপাত্মক নাট্যে অংশ নিয়ে থাকে) ঙ. পালাবন্দী গান এবং চ. খবর বা রিপোর্ট (যেখানে দুজন অভিনয়শিল্পী স্থানীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সমালোচনা পরিবেশন করে)। এই নাট্যের সমাপ্তি হয় উত্থাপিত সমস্যাগুলোর একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান প্রদানের মাধ্যমে। সমালোচনামূলক ও কৌতুকপূর্ণ এই গম্ভীরা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে থাকে। এতে কেবল সংগীতের অংশটুকুই থাকে পূর্বরচিত আর অবশিষ্ট গদ্যসংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে গম্ভীরানাট্য হিসেবে শুধু মাত্র ডুয়েট অংশটি, যা 'নানা' ও 'নাতিন' চরিত্রদ্বয়ের প্রথাগত নাচ ও পূর্বরচিত গান এবং তাৎক্ষণিক উপস্থাপনায় কোনো সামাজিক ঘটনাকে ব্যঙ্গ-কৌতুক ও শ্লেষাত্মক উপায়ে উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে এই গম্ভীরা কেবলমাত্র সামাজিক অসংগতিকে সমালোচনা করে তা নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা এনজিও পরিচালিত নানাবিধ সমাজ সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডেও গম্ভীরানাট্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনসাধারণের বিনোদনের জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে এই নাট্যের প্রচলন রয়েছে।

অষ্টকগান: গাজন উৎসবের অপরিহার্য সাংস্কৃতিক সম্ভারের আর একটি নাটগীতধর্মী পরিবেশনারীতি হচ্ছে অষ্টক। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে খুলনা, যশোর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয় এবং ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই অষ্টক পরিবেশনা লক্ষ্য করা যায়। চৈত্রসংক্রান্তির সাত থেকে পনের দিন আগে থেকে এই অনুষ্ঠানটি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সাধারণত বাড়ির উঠানে বা কোনো মন্দির প্রাঙ্গনে এর প্রদর্শনী হয়ে থাকে। বর্গাকার আয়তনের তিনদিকে দর্শক এবং একদিকে কুশীলব উভয়ে সমতল ভূমির অবস্থানে অষ্টকগানের পরিবেশনা হয়ে থাকে। অষ্টকগানের এরূপ নামকরণের কারণ কী-এ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। কারো মতে অষ্টসখী এর মূল চরিত্র। অষ্টসখী অষ্ট আঙ্গিকে অষ্ট রীতির সুর ও নৃত্যগীতে শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করার প্রসঙ্গ থেকেও এরূপ নামকরণ

বাংলায় পুঁথিসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের মূলে পূর্ববর্তী কথানাট্যের ধারায় পরিবেশিত 'মঙ্গলকাব্যে'র প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগে ইসলামী ভাবধারায় রচিত পুঁথিগুলি মঙ্গলকাব্যের ন্যায় গাওয়া হত বলে অনেকে মনে করেন। ধারণা করা হয় যে, ষোল শতকের পূর্ব থেকেই পুঁথিগুলির মৌখিক রচনার পরিবেশনা 'বৈঠকী' রীতিতে সক্রিয় ছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামে মরমীবাদের উদ্ভব এবং ধর্মাচারণের বাঁধাধরা প্রথার ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই পুঁথি লেখ্য বা নাটলিপি আকারে প্রকাশিত হয়। এ সময়ের প্রচলিত কথানাট্যরীতির ক্রমাগত জনপ্রিয়তার সাথে পুঁথিসাহিত্যের পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে ইসলামী সাহিত্য ও আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

প্রথমত, পুঁথিসাহিত্যের 'বৈঠকী'রীতির পরিবেশনা কথানাট্য বা বর্ণনাত্মক রীতির সংস্পর্শে এসে অনেকাংশেই কথানাট্যকে আত্মীকৃত করে নেয়, যার ফলে সপ্তদশ শতকের বাংলার ইসলামী ভাবধারার পরিবেশনায় যুক্ত হয় পীরবিষয়ক আখ্যান। যেমন– মাদারপীরের গান, গাজীরগান, সত্যপীরের গান, মানিকপীরের গান, খোয়াজখিজিরের গান প্রভৃতি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে প্রচলিত এই পীরকেন্দ্রিক পরিবেশনাকে কেউ কেউ আবার 'পীরপাঁচালি' নামেও আখ্যায়িত করেছেন। 'পীরপাঁচালী মূলত অসম্প্রদায়িক মনের সৃষ্টি। পীরের 'সেবা' 'হাজোত-মানোত' প্রভৃতি কৃত্যে হিন্দু মুসলিম সকলেরই সমান অধিকার। এ-শ্রেণীর পাঁচালীতে হিন্দু-মুসলিম পুরাণের একটি সমন্বিত রূপ আবিষ্কারের প্রয়াস আছে।'[৩৪] তথাপিও এই ধরনের পরিবেশনাকে কৃত্যমূলক বলাই শ্রেয়। পীরবিষয়ক এই সকল আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকেন একজন পীর, যিনি অসম্ভব রকম অলৌকিক কিছু ক্ষমতার অধিকারী হন। সাধারণ ফকিরের ছদ্মবেশে পীরের আবির্ভাব ঘটে। এরপর বিপথগামী অনুসারীদের হেদায়েত এবং সুপথে পরিচালনার মধ্য দিয়ে পীরের মাহাত্ম্য ও গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়ে থাকে এই জাতীয় আখ্যানে। ফকিরী বেশে পৃথিবীতে তার বিচরণের সময়ে সাধারণত তার সাথে একজন সঙ্গী থাকে। গাজীর গানে পীরগাজীর সঙ্গী হচ্ছে 'ভাই কালু', মাদারপীরের গানে 'জুম্মল' প্রভৃতি।

বর্ণনাত্মক রীতির ধারায় পীরবিষয়ক এই সকল আখ্যানের নাট্যলক্ষণ বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে গায়েন একই সঙ্গে কথক, বর্ণনাকারী এবং চরিত্রের অদ্বৈতরূপ। গায়েনের পায়ে ঘুঙুর, হাতে চামর, সহযোগী অভিনেতা (পীরের সঙ্গী, কখনো একে সহযোগী গায়েন, আবার কোথাও জোকারও বলা হয়ে থাকে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অভিনেতা হাস্যকৌতুক এবং ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে অভিনয় করে থাকেন), দোহার, ছুকরি (পুরুষ কর্তৃক নারীবেশে অভিনয়) এবং যন্ত্রীদলের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে এই রীতির পরিবেশনা।

গায়েন একাই বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য এবং কাব্যাভিনয়ের মাধ্যমে এবং কখনো কখনো সহযোগী অভিনেতার সাথে সংলাপাত্মক অভিনয় এবং দোহার দলের কারো কারো সাথে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অভিনয়ের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ আখ্যান পরিবেশন করে থাকেন। মূল গায়েন আখ্যানের প্রধান চরিত্র যেমন– গাজীর গানের গাজী, সেকেন্দারশাহ বাদশা; মাদারপীরের গানের মাদার, শেরশাহ বাদশা; মানিকপীরের গানে মানিক পীরের চরিত্রে সংলাপাত্মক গীত, গদ্য এবং বর্ণনাত্মক গীত ও গদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। পক্ষান্তরে, আখ্যানের প্রধান পার্শ্ব চরিত্রগুলো গায়েনের সহযোগী অভিনেতা এবং নারী চরিত্রের অভিনয়ে ছুকরিগণ সংলাপাত্মক গদ্যে চরিত্রাভিনয় এবং নৃত্য ও বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। কুশীলবগণ আখ্যান–বর্ণিত একাধিক চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিনয়, চরিত্রের পরিবর্তন এবং আখ্যান–বর্ণিত স্থান রূপায়ণ ও পরিবর্তনে লোকনাট্য ঐতিহ্যের 'পরিক্রমণ' কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে গায়েনের বর্ণনাত্মক গীতের তালে ছুকরির দলগত নৃত্যাভিনয় এসকল পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে আরো নাটকীয় করে তোলে।

বর্তমান বাংলাদেশে পীরবিষয়ক বর্ণনাত্মক রীতির আখ্যানের মধ্যে গাজীর গান, মাদারপীরের গান, সত্যপীরের গান, মানিকপীরের গান এবং খোয়াজ খিজিরের গান প্রভৃতি প্রচলিত রয়েছে। গাজীর গানের প্রচলিত পালাগুলোর মধ্যে–ফকিরা পালা, দিদার বাদশার পালা, হেরেমশাহ বাদশা, তাজেল বাদশা, জামাল বাদশা, গাজীর বিয়ে, গাজী কালু–চম্পবতীর পালা প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। পুঁথি আকারে গাজী সাহেবের গান, কালু-গাজী চম্পবতীর

পাঁচালি, গাজীর পুঁথি, বড়ে খান গাজীর কেরামতি প্রভৃতি নামে পরিবেশিত হয়। মাদারপীরের গানের প্রচলিত আখ্যানসমূহের মধ্যে বড় পীর সাহেবের পালা, মাদারের জন্ম পালা, ওরস নামা, বিবি কুসুমের পালা, বিভীষণ পালা প্রভৃতি প্রচলিত। সত্যপীরের গানের প্রচলিত পালাগুলোর মধ্যে সত্যপীর, সুন্দর সাধু, বিশু কাঙ্গাল, রাজা হরিষচন্দ্র, বাদশা বাহরাম, দিলবর বাদশা, আকবর বাদশা, দাঁতাকর্ণ প্রভৃতি এবং মানিকপীরের গানে মানিকের জন্ম, কানুঘোষের পালা, গুলে বাকাওয়ালী, শেখ ফরিদের পালা, কালু-গাজী চম্পাবতী প্রভৃতি প্রচলিত রয়েছে।

বর্ণনাত্মক রীতির পাশাপাশি সংলাপাত্মক রীতিতেও এই মুসলিম পীর ও সাধু বিষয়ক পরিবেশনার প্রচলন রয়েছে। যেমন– ইমাম যাত্রা, গাজীর যাত্রা, মানিকপীরের যাত্রা, সত্যপীরের যাত্রা প্রভৃতি। চরিত্রানুগ পোশাক, রূপসজ্জা এবং দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করে সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয় এই সকল যাত্রার আখ্যান। তবে প্রবেশ–প্রস্থানের ক্ষেত্রে দুটি রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। কখনো কখনো কুশীলবগণ আসরের পাশে কোনো অস্থায়ী গ্রিনরুম তৈরি বা গৃহ ব্যবহার করে প্রবেশ–প্রস্থান করে থাকে, আবার কখনো সকল কুশীলব অভিনয় আয়তনের কেন্দ্রে একটি বৃত্তাকারে অবস্থান নিয়ে সেখান থেকেই প্রবেশ–প্রস্থান করে থাকে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে আখ্যানের নির্দিষ্ট দু–একটি চরিত্র আসরের পার্শ্ববর্তী কোনো গৃহকে গ্রিনরুম হিসেবে ব্যবহার করে বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের অভিনয়ে প্রবেশ বা প্রস্থান করে থাকে। এই ধরনের যাত্রা পরিবেশনায় আখ্যানের সংলাপাত্মক অভিনয়ের সাথে, পূর্ব নির্ধারিত অংশে বর্ণনাত্মক গীত ও নৃত্য ব্যবহার করা হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশনায় বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলের 'পাইল্যা যাত্রা বা পাতিলা গান', নড়াইলের 'ছওয়াল জবাব' মানিকগঞ্জ, নবাবগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের 'বিচার গান' প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

মুসলিম বীর, পীর এবং সাধু–সন্ন্যাসীদের জীবন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা মূলক কথনরীতির পরিবেশনা যা 'পুঁথি পাঠ' নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহুল প্রচলিত একটি রীতি। ইউসুফ–জোলেখা, গাজী-কালু-চম্পাবতী, সোনভান, আমীর–হামজা, কাছেদ-নামা, আহাদ-নামা প্রভৃতি জনপ্রিয় পুঁথি আজও বাংলার গ্রাম–অঞ্চলের লেপা–উঠানের দর্শক পরিবেষ্টিত গায়েনের সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

মুসলিম বীর ও পীর বিষয়ক আখ্যান পরিবেশনায় বৃত্তাকার, বর্গাকার এবং আয়তকার এই তিন ধরনের অভিনয় আয়তনের অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বর্গাকার অভিনয় আয়তনের ক্ষেত্রে ১২ × ১২ বর্গফুট অথবা ১০ × ১০ বর্গফুট; আয়তাকার অভিনয় আয়তনের ক্ষেত্রে ১০ × ১২ ফুট অথবা ১২ × ১৫ ফুট এবং বৃত্তাকার অভিনয় আয়তনের ক্ষেত্রে ১২ ফুট থেকে ১৫ ফুট ব্যাসার্ধের ভূমি সমতল মঞ্চের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চারটি খুঁটির ওপর সামিয়ানা, নিচে ভূমি সমতলে উপস্থাপিত হয়ে থাকে এসকল আখ্যান। তবে বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অভিনয় আয়তন ১ থেকে ২ ফুট উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়। গাজীর গান, গাজীর যাত্রায় বর্গাকার, আয়তাকার এবং বৃত্তাকার আয়তন; মানিক পীরের গানে বর্গাকার এবং বৃত্তাকার আয়তন; সত্যপীরের গান এবং সত্যপীরের যাত্রায় বৃত্তাকার আয়তন; মানিকপীরের জারি এবং মানিক যাত্রায় বর্গাকার আয়তন; মামাই চম্পার কিচ্ছাকাহিনীতে বর্গাকার এবং খোয়াজ খিজিরের জারিতে বৃত্তাকার আয়তনের আসর বা মঞ্চের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বর্গাকার এবং আয়তাকার আয়তনের ক্ষেত্রে কুশীলবগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মঞ্চের এক বা দুই পার্শ্বে অবস্থান করেন এবং দর্শক আসরের তিন বা চার দিকে আসন গ্রহণ করেন। তবে বর্গাকার আয়তন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– কুশীলবগণ কখনো একটি কেন্দ্রীয় বৃত্তে অবস্থান করেন এবং দর্শক চারদিকে বর্গাকার অবস্থায় আসন গ্রহণ করেন। বৃত্তাকার আয়তনের ক্ষেত্রে কুশীলব এবং দর্শক উভয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে বৃত্তাকারে অবস্থান গ্রহণ করেন।

এই সকল আখ্যান ইসলাম ধর্ম ও বিষয় ভিত্তিক হলেও গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাধারণ মানুষই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তারাই পীরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলস্বরূপ, নানাবিধ মানসিক আকাঙ্খা পূরণ বা মানতের উদ্দেশ্যে– যেমন, রোগ মুক্তি, সন্তান লাভ, কৃষিতে অধিক ফলন, গোবাদি পশুর স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি;

নানাবিধ কৃত্যানুষ্ঠান, যেমন– খৎনা, বিবাহ, শিশু–সন্তানের জন্ম প্রভৃতি এবং ধর্মীয় উৎসব–অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজন করে থাকে এই পীর বিষয়ক পরিবেশনা।

দ্বিতীয়ত, 'বেঠকী'রীতির পরিবেশনার আর একটি জনপ্রিয় ধারা যা 'জঙ্গনামা' নামে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। কারবালার বিয়োগান্তক কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত অসংখ্য পুঁথি, যাকে সাধারণভাবে 'জঙ্গনামা' বলা হয়। এই ধারার সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত এবং প্রাচীন পুঁথিটি হলো মুহম্মদ খানের 'মুকতুল হোসেন'। জঙ্গনামা অনুষ্ঠানটিও কথানাট্যরীতির সংস্পর্শে এসে গ্রহণ-বর্জন এবং আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে 'জারি' (শোকসংগীত, গাথা জাতীয় রচনা বলেও অভিহিত করেছেন কেউ কেউ) নামে সমগ্র বাংলায় ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

জারি: 'জারি' ফারসি শব্দ, যার অর্থ ক্রন্দন বা বিলাপ। জারিগান তাই করুণ রসের আহাজারি মূলক গান। বিলাপ এবং বিষাদ এ গানের মূল ভাব নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু পল্লীর সর্বত্র 'জারী' বলতে ক্রন্দন বোঝায় না, এমন এক শ্রেণীর গান বোঝায় যা গীতিকা বা ব্যালাড শ্রেণীর।'[৩৩] কারবালার কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই রীতির প্রচলন ও বিকাশ ঘটলেও জারি কেবলমাত্র করুণ ও বিয়োগান্তক ঘটনাবলীর মধ্যে সীমবদ্ধ থাকেনি। ঐতিহাসিক বীর চরিত্রদের নিয়ে রচিত বীরগাথা- নোয়াখালী অঞ্চলের 'চৌধুরীরর লড়াই, আবার ময়মনসিংহ বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিভিন্ন জনপ্রিয় পালা যেমন মহুয়া, দেওয়ানা-মদিনা, মলুয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে প্রেমগাথা। তবে জারিতে বিভিন্ন রস-এর ব্যবহার হলেও করুণ রসই এর মূল শক্তি। গায়েনের সুরেলা আখ্যানগীতের তালে একদল অভিনেতা'র (দোহার) সুনিয়ন্ত্রিত নিপুণ নৃত্যের সমবেত উপস্থাপনায় জারি হয়ে ওঠে অনবদ্য এক পরিবেশনা। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং দক্ষিণাঞ্চলের জনজীবনে জারিগানের বীরত্বপূর্ণ এবং করুণ বিষাদময় ভাবসমূহের যে বিস্তার ও বিচরণ তা আজও এই রীতির প্রাচীন গৌরবগাথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জারিগানের পরিবেশনায় দুটি ধরন লক্ষ করা যায়। কখনো গায়েনের গীত ও যন্ত্রীদের বাদ্যের তালে আরও বিশ পচিশজন জন দোহার নৃত্যাংশে অংশগ্রহণ করেন। এসময়ে তাদের হাতে থাকে একটি করে রুমাল। জারির করুণ বিষাদময় সঙ্গীতের আহাজারির তালে দোহারগণের মাতম নৃত্যে সত্যিই আসরটি যেন হয়ে ওঠে আর এক কারবালার প্রান্তর। এছাড়া দ্বিতীয় ধরনের জারিতে রয়েছে নৃত্যের অনুপস্থিতি। এক্ষেত্রে দশ বারজন দোহার বৃত্তাকারে বসে ধুয়া ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করলে গায়েন বৃত্তের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্যের তালে জারি পরিবেশন করেন। জারিগান সাধারণত বৃত্তাকারে পরিবেশিত হয় যেখানে দর্শকও বৃত্তাকারে অবস্থান করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে জারিগানের বিষাদময় সংগীত আজও সর্বত্র গীত হতে দেখা যায়। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের জারিগান, জারিগজল, বাংলাজারি; বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জারিগান, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জারিগান, বৃহত্তর কুমিল্লার নাইচের জারি, বৃহত্তর দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের জং-জারি, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর এবং খুলনা অঞ্চলের মানিকপীরের জারি; যশোর-সাতক্ষীরা অঞ্চলের মামাই চম্পার কিচ্ছাকাহিনী জারি; দোহার, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের বেড়াভাসান এবং খোয়াজখিজিরের জারি প্রভৃতি বাংলাদেশের লোকনাট্যে জারি পরিবেশনারীতির ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তাকেই প্রমাণ করে।

প্রেম-প্রণয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনা

বাংলাদেশের লোকনাট্য চর্চায় প্রেম-প্রণয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যানের উদ্ভব ও বিকাশ মূলত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মাধ্যমে। তৎকালীন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আবির্ভূত বেশ কিছু মুসলমান কবি যারা পারস্যদেশীয় জনপ্রিয় আখ্যান ও রচনার বঙ্গানুবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই শ্রেণীর কবিদের পাশাপাশি আরো এক শ্রেণীর মুসলিম কবি যারা সরাসরি বঙ্গানুবাদ না করে বরং প্রচলিত ও জনপ্রিয় কাহিনী অনুসরণে নিজ নিজ কবিকল্পনা দ্বারা আখ্যান রচনায় ব্রতী হলেন। এই ধরনের সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে অলৌকিক দেবচরিত্র, ধর্মতান্ত্রিক দৈবচেতনা ও তার মহিমা প্রচারণার পরিবর্তে স্বপ্নমূর্চ্ছনায় তরঙ্গায়িত প্রেমের অভিসারী রক্ত-মাংসের মানুষ। কামনায় উচ্ছল কোনো মানবীয় নারীর কল্পজগতের আহবান যেন গভীর সমুদ্র থেকে গহীন অরণ্য হয়ে পৌঁছে দেয় আর এক স্বপ্নপুরীতে। প্রেম আর উদার মানবতাবাদের প্রচারই যেন এসকল কাব্যের প্রাণ হয়ে উঠল।

মধ্যযুগের বাংলায় পাঁচালি সাহিত্যের বিকাশের ধারায় এই সকল প্রেম–প্রণয়মূলক কাব্য একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে, যা প্রণয়–পাঁচালি নামেও পরিচিতি পায়। মধ্যযুগে পাঁচালি হচ্ছে মূলত আখ্যায়িকামূলক পদ্য রচনা। ধর্মীয় পাঁচালি ও কৃত্যমূলক পাঁচালি– শ্রীরাম পাঁচালি, ভারত পাঁচালি, মনসার পাঁচালি প্রভৃতি পাঁচালির নানাবিধ আখ্যান–কাব্যের ধারায় পঞ্চদশ শতকে এসে যুক্ত হয় এই সকল প্রণয়মূলক আখ্যান বা প্রণয়–পাঁচালি।

এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও নাট্যগুণ বিচারে অনেকেই এর নৃত্য, গীত, কাব্য ও আখ্যানের দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পরূপ নির্ণয় করে একে বর্ণনাত্মক রীতির পর্যায়ভূক্ত করেন। মধ্যযুগের এই সকল প্রণয়–পাঁচালিও কথানাট্যরীতির ধারায় পরিবেশিত হতো। যেখানে গায়েন দোহার সহযোগে একাই নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে, কখনো বা উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন। প্রণয়মূলক আখ্যানের বর্ণনাত্মক পরিবেশনার সূত্রেই হয়তো বা অনেক গবেষক একে প্রণয়–পাঁচালি নামে আখ্যায়িত করে থাকবেন এরূপ ধারণা অসংগত নয়।

এই ধারার যে সকল সাহিত্যকর্ম ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয় তার মধ্যে– আলাউলের 'পদ্মাবতী', দৌলত উজির বাহরামের 'লাইলী মজনু', শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা', দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর', মোহাম্মদ মুকিমের 'গুলে বাকাওলী', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', কাজী দৌলতের 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী', মাগনঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', হপ্তপয়কর'; দোনাগাজীর 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল', আব্দুল হাকিমের 'ইউসুফ জোলেখা, 'লালমতি সয়ফুলমুলক', মোহাম্মদ খতরের 'আলেফ লায়লা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই সকল প্রণয়োপাখ্যানের লেখকগণ ধর্মীয়–আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের বাইরে কাব্যচর্চাকে এমন এক স্তরে উন্নীত করলেন, যেখানে– 'বাঙলা আখ্যান কাব্যের ধারায় লাউসেনের বীরত্ব, হরিশ্চন্দ্রের ধর্মসাধনা, নাথ-সিদ্ধাদের আত্ম-কৃচ্ছ্রতা, কালকেতুর ভোজন ও শিকার, ফুল্লরার বারমাস্যা, রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার পাশাপাশি স্থান করে নিল জোলেখার কাম ও প্রেম, সয়ফুলের সমুদ্রযাত্রা, যুদ্ধ ও বীরত্ব, গহীন অরণ্যে মজনুর আর্তনাদ, লোরের প্রণয়াভিসার, বিবাহিত চন্দ্রানীর অবৈধ প্রণয়।'[৩৬]

প্রণয়–উপাখ্যানগুলো প্রচলিত পাঁচালির ঐতিহ্যের ধারায় রচিত হলেও, প্রেম-প্রকৃতি-নারীর সৌন্দর্য, রূপ ও রস বর্ণনায় যে ভাষা–রুচি ও প্রয়োগকৌশলের আশ্রয় নেওয়া হলো, তার ফলে এ সকল উপাখ্যান দ্রুতই সামাজিক স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পেল। তাছাড়া প্রণয়োপাখ্যান উপস্থাপনের আসর বা মঞ্চ থেকে মাঙ্গলিক উপাদান (কৃত্য মূলক বিভিন্ন উপাদান, উপকরণ) সমূহ দূর হওয়ায় অন্যান্য ধর্মীয় ও কৃত্যপাঁচালি থেকেও এটি একটি স্বতন্ত্র্য স্থান নিতে সক্ষম হয়। এমনকি কথানাট্যের প্রচলিত একক কুশীলব বা গায়েন নির্ভর গীত, কাব্য ও নৃত্য প্রধান উপস্থাপনা হলেও, প্রণয়োপাখ্যানের গায়েন পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করলেও হাতে আর চামর রইল না, পরিবর্তে কখনো উত্তরীয় আবার কখনো বাদ্যযন্ত্র যেমন– দোতারা, বেহালা বা বেনা প্রভৃতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

সতেরো শতকের বাংলাদেশে লোকনাট্যচর্চায় প্রেম ও প্রণয়মলূক এবং বাহ্যত ধর্মনিরপেক্ষ আরো একধরনের মৌখিকরীতির পরিবেশনা যুক্ত হয়, যা সর্বসম্মতভাবে 'গীতিকা'নামে পরিচিতি লাভ করে। গবেষকগণ বাংলা লোকসাহিত্যের এই সকল গীতিকা–কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। 'নাথ-গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা।'[৩৭] তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অদ্যাবধি গীতিকা হিসেবে মৈমনসিংহ গীতিকা অধিক প্রচলিত এবং একই সাথে জনপ্রিয়। গীতিকা মূলত নর-নারীর প্রেমমূলক রচনা। প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃসংস্কারের সংঘাত যে কত প্রবল তা-ই এ সকল গীতিকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মূলত 'গীতিকাগুলিতে মানবতাবাদ, মানবীয় কামনা-বাসনা, বলিষ্ঠ নারী চরিত্রের উপস্থিতি এবং ধর্মীয়-নৈতিক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদস্পৃহা পরিলক্ষিত হয়, তা একে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করে।'[৩৮] রচনার আকারগত দিক থেকে এই সকল গীতিকা মঙ্গলকাব্যের পালায় বিভক্ত নয় বরং এগুলো স্বল্পাকারের সম্পূর্ণ আখ্যান কাব্য। গীতিকা উদ্ভবকাল থেকে দর্শক সম্মুখে বর্ণনাত্মক রীতির ধারায় পরিবেশিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে প্রণয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যান নির্ভর পরিবেশনার মধ্যে– পালাগান, আলকাপগান, ঝুমুর যাত্রা, মাইট্টা তামশা, পালাটিয়া গান, মাটিয়াল গান, তারী গান প্রভৃতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

'কিচ্ছাগান', 'কিচ্ছাকাহিনী' প্রভৃতি নামে ব্যাপক
পালাগান: বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'কিচ্ছাগান', 'কিচ্ছাকাহিনী' প্রভৃতি নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাথে একধরনের পরিবেশনার প্রচলন রয়েছে, যা সাধারণভাবে 'পালাগান' নামেও পরিচিত। অন্যান্য বর্ণনাত্মক রীতির পরিবেশনার ন্যায় পালাগানও গায়েন নির্ভর পরিবেশনা এবং একজন গায়েন, ডায়না (সহ অভিনেতা) এবং পাঁচ থেকে ছয়জন যন্ত্রীসহ মোট সাত থেকে আটজন কুশীলব দ্বারা উপস্থাপিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের অন্যান্য বর্ণনাত্মক রীতির পরিবেশনা থেকে ধর্ম-নিরপেক্ষ এই পালাগানে বেশ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। পালাগানের গায়েন পায়ে ঘুঙুর এবং হাতে চামর ব্যবহার করেন না। কিন্তু গায়েনের পোশাক এবং অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে দ্রব্য-সামগ্রির যে বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়, তাতে সমগ্র পালাটি ভিন্ন স্বাদে, ভিন্ন দৃষ্টিতে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। গায়েন তার পোশাক হিসেবে- জরির কারুকাজ করা ফুল-হাতা অথবা হাফ-হাতা একটি জামা এবং একটি একরঙা লুঙ্গি অথবা রঙিন ছাপার ঘাগড়া, তার সাথে কোমর বন্ধনী হিসেবে সিল্ক-এর রঙিন ছাপার শাড়ি বা বড় ওড়না ব্যবহার করে থাকেন। কোমর বন্ধনী হিসেবে শাড়ি বা ওড়নার ব্যবহার যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন। এটি আখ্যানের পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্র রূপায়ণ উপযোগী করে ব্যবহার করা হয়। পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে কখনো এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়, যেন মনে হয় রাজা, মন্ত্রীদের ব্যবহৃত চাদর অথবা দিনমজুরের কোমরের গামছা, আবার নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে এই শাড়িটিই হয়ে ওঠে মাথার ঘোমটা বা ওড়না। দ্রব্য-সামগ্রি হিসেবে বালিশ, শিশু-পুতুল, রঙিন চশমা, বাঁশি, গামছা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই সকল দ্রব-সামগ্রীর বহুবিধ ব্যবহার, যেমন- একটি বালিশকে কখনো ঘোড়া, কখনো লেখার কাগজ, চিঠি, মৃতব্যক্তি বা ভারী বস্তুরূপে প্রদর্শন করা হয়। পোশাক ও দ্রব-সামগ্রির এইরূপ বহুবিধ ব্যবহার যা, দর্শকের বিশ্বাস ও বিনোদনের কোথাও একটুকু কমতি হয় না, বরং আরেকবার পালার আসরে ছুটে যেতেও যেন কোনো অরুচি হয় না।

মূলগায়েন বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক উভয় অভিনয় উপাদান প্রয়োগ করে পালাগানের আখ্যান উপস্থাপন করে থাকেন। তবে সংলাপাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি 'ডায়নার' (দোহার দলের একজন। তিনি মঞ্চে গায়েনের দক্ষিণহস্ত অনুসারে, দোহার দলের ডানদিকের শেষে বসেন, তাই এর নাম ডায়না) সাথে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নিয়ে সমগ্র পরিবেশনাকে আরো নাটকীয় করে তোলেন। উল্লেখ্য ডায়না এক্ষেত্রে কোনো প্রকার আঙ্গিক অভিনয় করেন না। অর্থাৎ তিনি তার আসন থেকে দাঁড়িয়ে কোনো প্রকার আঙ্গিক অভিনয় করে না, বরং বসা অবস্থানে থেকেই গায়েনের সাথে যাবতীয় সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে গায়েন একাই চরিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আখ্যানের একাধিক চরিত্রের অভিনয় করে থাকেন। অভিনয় উপাদান, পোশাক এবং দ্রব্য-সামগ্রির এইরূপ নান্দনিক ব্যবহারের ফলে পালাগান বর্ণনাত্মক অভিনয়ের একঘেয়ে উপস্থাপনার মাঝে যথেষ্ট বৈচিত্র্য তৈরী করতে সক্ষম হয়, যা দর্শক উপভোগে আরো বেশি হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। গবেষকদের মতে, মূলত আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরু দিকের কোনো এক সময় গীতিকাসমূহ তার প্রচলিত বর্ণনাত্মক চরিত্র হারিয়ে সংলাপ ও বর্ণনার এক অপূর্ব সমন্বয়ে 'মিশ্ররীতির' ধারায় জনপ্রিয়তার সাথে প্রদর্শিত হতে থাকে। মহুয়া, মলুয়া, কমলা, কেনারাম, রূপবতী, ঈশা খাঁ দেওয়ান, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, দেওয়ানা ভাবনা, ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী, কাজলরেখা, ভেলুয়া সুন্দরী, কঙ্ক ও লীলা, মদনকুমার মধুমালা, দেওয়ানা মদিনা, বিদ্যাসুন্দর, প্রভৃতি জনপ্রিয় আখ্যান সমূহ আজও বাংলার গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত দর্শক সমাদৃত হয়ে আসছে।

আলকাপ গান: বৃহত্তর রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, স্থানীয় জনসাধারণের বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে 'আলকাপ গান' নামে ধর্মনিরপেক্ষ একধরনের পরিবেশনারীতির বহুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। বছরের প্রায় সকল সময় বিভিন্ন পূজা- দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা এবং অন্যান্য পার্বণ ও উৎসব, যেমন-বিবাহ, অন্নপ্রাশন, স্বাদ (গর্ভবতী মহিলাদের পছন্দের খাবার প্রদান উপলক্ষ্যে উৎসব) প্রভৃতি উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে এই আলকাপ গান।

সাধারণত দশ থেকে বারজন সদস্যের একটি দল আলকাপ গান পরিবেশন করে থাকে। দলে একজন 'সরকার' (যিনি দলের পরিচালক, প্রশিক্ষক এবং অভিনেতা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। পরিবেশনায় তিনি হারমোনিয়াম

আলকাপ গান পরিবেশনা

বাজিয়ে থাকেন), একজন 'কাইপ্যা' অন্যত্র 'কাপিয়াল'ও বলা হয় (কাইপ্যা দলের মূল জোকার এবং সংলাপাত্মক অভিনয়ে প্রধান চরিত্রে অংশগ্রহণ করে), তিন থেকে চারজন 'নাচিয়ে' অন্যত্র 'ফেমিলি' বা 'ছুকরি'ও বলা হয়, এ ছাড়া পাঁচ থেকে ছয়জন দোহার এবং যন্ত্রীর অংশগ্রহণে আলকাপ গান পরিবেশিত হয়ে থাকে।

সমন্বিত যন্ত্রসংগীত এবং বন্দনা পরবর্তী একটি সম্পূর্ণ আলকাপ গান কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক পর্বে উপস্থাপিত হয়ে থাকে:

ক. নাচিয়েদের নৃত্য ও গীত মূলক পরিবেশনা বা খেমটা নাচ। এ অংশে জনপ্রিয় গানের সাথে নৃত্য ও গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের নৃত্যে দেহগত প্রেম-উত্তেজনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

খ. ডুয়েট বা দ্বৈত অভিনয়। এ অংশে কাইপ্যা এবং একজন নাচিয়ের অংশগ্রহণে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত সংলাপাত্মক অভিনয় উপস্থাপিত হয়। নির্ধারিত বিষয়ের ওপর কাইপ্যা ও একজন নাচিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে সৃষ্ট হাস্যরসাত্মক সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকে এই পর্বের অভিনয়।

গ. ছড়া পরিবেশনা। এ পর্যায়ে সরকার নিজে একটি বর্ণনাত্মক কাব্যে বা ছন্দ আকারে ছড়া পরিবেশন করেন। সাধারণত সমাজের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, শিক্ষা ব্যবস্থা, ফসলচুরি, বিভিন্ন আচরণ, যেমন- বোকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দশ থেকে বিশ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত ছড়া উপস্থাপিত হয়ে থাকে এই পর্বে।

ঘ. কাপ বা আখ্যান ভিত্তিক সংলাপাত্মক পরিবেশনা। দেড় থেকে দুই ঘণ্টার আয়তনে পরিবেশিত এই অংশটি সম্পূর্ণ হাস্য-রস ও ব্যঙ্গাত্মক পরিবেশনা। ডুয়েটের মতোই বিষয় পূর্ব নির্ধারিত থাকলেও কুশীলবগণ তাৎক্ষণিক ভাবেও সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশন করে থাকেন। তবে এই অংশের সংলাপাত্মক অভিনয়ে গদ্যের পাশাপাশি সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ের পরিবেশনা দেখা যায়। কাপ অংশের আখ্যান বা কাহিনী কখনো পুরাণ ও ইতিহাস নির্ভর, যেমন- রামায়ণ, মহাভারত, পলাশীর যুদ্ধ, মুঘল সম্রাট প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক পরিবেশনাও হয়ে থাকে।

ঙ. পুনরায় সরকার কর্তৃক ছাড়া পরিবেশনা।

চ. পুনরায় নাচিয়ে কর্তৃক নৃত্য ও গীতাভিনয় বা খেমটা নৃত্যের পরিবেশনা।

আলকাপ শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, আল এবং কাপ দুটি শব্দ যুক্ত হয়ে একসঙ্গে আলকাপ হয়েছে বলে অনেকেই একমত। এক্ষেত্রে আল অর্থ হুল বা কাটা এবং কাপ অর্থ রঙ্গ–রস সৃষ্টি করা এই অর্থে রঙ্গরস ও ব্যঙ্গাত্মক নাট্য পরিবেশনা হিসেবে আলকাপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কারো মতে আলকাপ মুসলমানদের দ্বারাই তৈরী এবং এই গানের সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সুর–সম্রাট মিঞা তানসেনের প্রভাব। আবার কারো মতে গোড়াতে আলকাপ গান শিবের গাজন উৎসবের সাথে যুক্ত ছিল এবং বর্তমান গম্ভীরানাট্য আলকাপ গানেরই ডুয়েট পর্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব। তবে উৎপত্তি যেখানে এবং যাদের দ্বারাই হোক না কেন, আলকাপ গান শুধুমাত্র হাস্য–রসাত্মক ব্যঙ্গমূলক নাট্য নয়। বরং এ হচ্ছে সমাজের সেই অবহেলিত ও নিম্নবর্গীয় মানুষের নাট্য যারা তাদের চারপাশের অসংগতি–অসমতাকে এভাবেই দেখতে চেয়েছে, দেখাতে চেয়েছে, চেয়েছে প্রতিবাদ করতে।

বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মভিত্তিক পরিবেশনা

বর্তমানে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাঝে যে সকল পরিবেশনা দৃষ্ট হয় তার মধ্যে অস্তিত্বশীল একমাত্র পরিবেশনা 'বুদ্ধা সংকীর্তন' (পালাগান) আজও বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবেশিত হয়। প্রায় দশ বারোজন দোহার পরিবেষ্টিত হয়ে গায়েন এই কীর্তন পরিবেশন করেন। বাড়ির উঠান এবং মন্দির প্রাঙ্গনে এই পরিবেশনা হয়ে থাকে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'গায়েনের নাচ' নামে আরও এক ধরনের পরিবেশনারীতির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে নাথধর্ম প্রভাবজত পরিবেশনা যা মূলত 'নাথগীতিকা' নামে পরিচিত। নাথধর্ম বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত একটি ভিন্ন ধর্ম যা পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের মূলধারার সাথে মিশে যায়। নাথসাহিত্য নাথসম্প্রদায়ের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এসকল সাহিত্য বা আখ্যান থেকে নাথধর্মীয় ভাবচেতনা ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে অসাম্প্রদায়িক এবং সহজ-সরল মানবিক ভাবের বিকাশ হওয়ায় ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। নাথগীতিকায় ধর্ম-পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ের পরিবর্তে যোগশাস্ত্রের কথা উল্লিখিত হওয়ার ফলে বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তা ব্যাপক সমাদৃত হয়। নাথগীতিকার মূলত দুইটি ভাগ রয়েছে। যার একটিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নাথগুরুদের জীবন ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগে মানিকচন্দ্র রাজার ছেলে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নাথগীতিকার প্রধানতম আখ্যান বা কাব্যের মধ্যে মধ্যযুগে রচিত শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত 'গোরক্ষবিজয়' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রাণী ময়নামতি এবং পুত্র রাজা গোবিন্দ্রচন্দ্রের কাহিনী ভিত্তিক রচনা 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছে, যা সতেরো ও আঠারো শতক পর্যন্ত জনপ্রিয়তার সাথে পরিবেশিত হত। 'মীননাথের গান' এবং 'গোরক্ষনাথে গান' নামে এক ধরনের নাথগীতিকা উত্তরবঙ্গে আজও প্রচলিত রয়েছে।

নাটোরের দীঘাপটিয়ায় 'যুগী'র গান' নামে কায়াসাধনা ভিত্তিক নাথ সম্প্রদায়ের এক ধরনের পরিবেশনার প্রচলন রয়েছে যা ঐ অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়। বিভিন্ন উৎসব এবং কৃত্যানুষ্ঠানে যুগীর গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। দোহার ছাড়া আখ্যান পরিবেশনায় চারজন কুশীলব চারটি চরিত্র যেমন–গুরু, ভরতুদাস, শ্যামদাস এবং যোগিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। সাধারণত রাতের বেলা যে কোনো খোলা জায়গা বা বাড়ির উঠানে চারদিকে দর্শক আবেষ্টনে কুশীলবগণ বৃত্তাকারে আখ্যান পরিবেশন করেন। যুগীর গানের আখ্যান নাটলিপি অনুসৃত নয়, গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই আখ্যান পরিবেশিত হয়ে আসছে। পরিবেশনায় অভিনয়–উপাদান হিসেবে সংলাপাত্মক গীত ও গদ্যের ব্যবহার মুখ্য ভূমিকা পালন করে। রাজশাহী অঞ্চলে 'যুগীরগানে'র ন্যায় কায়াসাধনা ধর্মী আর এক ধরনের পরিবেশনা যা 'যোগীপর্ব' নামে পরিবেশিত হয়। তবে এর অভিনয় আয়তন ও দর্শক অবস্থান উভয়ই বৃত্তাকার। রাজবাড়ী অঞ্চলে 'গোরক্ষনাথের পাঁচালী' এবং রাজশাহী অঞ্চলে 'গোরক্ষের গান' নামে নাথগীতিকা মূলক পরিবেশনার প্রচলন আজ এর সর্বশেষ অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে।